॥ প্রথম পরিচ্ছেদ ॥

আবির্ভাব কালের প্রেক্ষাপট ও জীবন

আবির্ভাব কালের প্রেক্ষাপট ও জীবন

" ... Can spring be far behind ?" - SHELLEY

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রবীন লেখক শ্রীঅমিয়ভূষণ মজুমদার। বর্তমানে সত্তর বছর বয়সেও তাঁর লেখনী আশ্চর্য রকমের ধারালো। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ষোল বছর পর অমিয়ভূষণের আবির্ভাব। বঙ্গভঙ্গের পর বিশ্বযুদ্ধের টালমাটাল অস্থিরতার ছোঁয়ায় সমাজজীবন তখন অস্থির। অথচ বুদ্ধির দৈন্য, অসংযমীপ্রকাশ ও রুচিবিকৃতির অনিবার্য প্রভাব এড়িয়ে এই মার্থক শিল্পী নিও - কল্লোলযুগ থেকে এক সম্পূর্ণ আলাদা অস্তিত্ব নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। পাঠকরুচির খাতিরে তিনি তাঁর নিজস্বতা কখনো পরিহার করেন নি। অমিয়ভূষণের লেখায় কোথাও কোথাও অ্যাবসার্ডিটির দিকে ঝোঁক থাকলেও তা জীবনধর্মীতায় অটল এবং এটাই তাঁর বিশিষ্টতা। নিজস্ব দৃষ্টি ও ভাষার সমন্বয়ে গঠিত বিশিষ্ট বাচনভঙ্গিটি তাঁর সম্পদ। অনেকটা কমলকুমারের কাছাকাছি তাঁর গদ্য আমাদের সতর্ক মনোযোগ দাবী করে। সমকালীন জীবিত কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে তিনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর অনুকরণীয় সাহিত্য প্রথত বাস্তবের অনুলিপি হয়ে থাকে না, বাস্তবের সমান্তরালে কল্পনার ছায়াপাত আলো অন্ধকার এক বন্ধুরতার জন্ম দেয় যা আমাদের মুগ্ধ করে। বিখ্যাত কবি ও ও সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য লিখেছিলেন, ''তরুণ কথাসাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রীযুক্ত-অমিয়ভূষণ মজুমদারই এমন একজন লেখক যিনি বহুবিধ কোণ থেকে জীবনকে দেখতে পারেন।''[১] লেখকের গড়শ্রীখণ্ড উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে সাহিত্য সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন, ''...লেখকের জীবনচিত্র ও গভীর তাৎপর্যবাহী মন্তব্য সমাবেশ সমুন্নত মনীষার নিদর্শন

বহন করে। এই উপন্যাসে আমরা এমন এক শ্রেণীর নরনারীর পরিচয় পাইলাম যাহারা সচরাচর উপন্যাসের বিষয়ীভূত হয় নাই। মাটির কাছাকাছি যে মানুষের জন্য রবীন্দ্রনাথ প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন কাব্যে তাহাদের দর্শন এ যাবৎ না মিলিলেও এই উপন্যাসে যে তাহাদের আবির্ভাব হইয়াছে এ ধারণা অযৌক্তিক নহে। আদিম, আপনাকে না জানা মানুষের অন্তরের অবগুণ্ঠন সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত না করিয়াই লেখক জীবন ও সাহিত্যের মধ্যে যে দৌত্যকার্য নিষ্পন্ন করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার মৌলিকতার কৃতিত্ব।''[২] বিদগ্ধ সমালোচক শ্রীসরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় মন্তব্য করেছেন যে জাতীয় বেদনা ও আশা বাসনার সংঘাতময় মৃত্তিকে জীবনের মৃত্তিকায় ও অশ্রুস্বেদের রঙে রচনা করতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন অমিয়ভূষণ। তাঁর মন্তব্য, ''...সরল কিন্তু অনাড়ম্বর শক্তিতে উপন্যাসের আকাশ মৃত্তিকায়, প্রান্তরে প্রাঙ্গনে এক অচ্ছেদ্যতার আবহাওয়া রচনা করতে পেরেছিলেন অমিয়ভূষণ। তিনিই বর্তমান কালের একমাত্র তরুণ উপন্যাসিক যিনি গ্রামীন অর্থনৈতিক কাঠামোকে তার তাৎপর্য সমেত বোঝেন। তার নানা স্তরের ভাঙা গড়ার সঙ্গে ব্যক্তির টানাপোড়েনকে যুক্ত করতে পারেন। ... মানুষের জীবনের সঙ্গে জমি জীবিকার সম্পর্ক, ছিন্নমূল হবার পূর্বক্ষণটিতে কোথায় টান পড়ে, কেমন করে গুঁড়িয়ে যায় বহুকালগত সম্পর্ক - লেখক যেন অপূর্ব নিরভিমান মন নিয়ে সেগুলোকে দেখেছেন, তাঁর নিরাসক্তির রাজসিংহাসন বিন্দু-মাত্র বিচলিত হয় নি, বেদনায় যখন মৃদুপিণ্ড উন্মূল হয়ে যাবার কথা, তখনও। ...বাজার চালু বহু সংস্করনধন্য অনেক উপন্যাসিকই অমিয়ভূষণের কাছে উপন্যাসিকের গুরু নিষ্ঠা, বিস্তৃতি ও অভিজ্ঞতা বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে পাঠ গ্রহণ করতে পারেন''[৩] ড:উজ্জ্বল কুমার মজুমদার তাঁর 'উপন্যাসে জীবন ও শিল্প'[৪] গ্রন্থে গড়শ্রীখণ্ড

উপন্যাসের দিকে লক্ষ্ করে বলেছেন যে শ্রেণীগত সীমার মধ্যে বিশেষ - ভাবে বিপর্যস্ত মধ্যবিত্ত ও কৃষক শ্রমিকের শোষিত অবস্থাই উপন্যাসিককে জীবনের নাটকীয় সম্ভাবনার দিকে আকৃষ্ট করেছে। যুদ্ধোত্তর সমাজ ব্যবস্থার যে বিপর্যয় এসেছে তা বলতে গিয়ে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর প্রতি তিনি সহানুভূতি দেখিয়েছেন। আবার তাঁর লেখায় বাঁচার স্বাদ, রূপ সৌন্দর্যের অতলান্ত আত্মান্তিক নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। তিনি যেন জনকলমন্ত্রমুখর মহাসমুদ্রের মাঝে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের নির্জন বাসিন্দা। ডঃ কমলকুমার সান্যাল বলেছেন, ''পঞ্চাশের মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ বিভাগ কিভাবে দুই বাংলার সীমান্ত অঞ্চলের জীবন যাত্রাকে বিঘ্নিত করেছে, বিপর্যস্ত এবং আলোড়িত করেছে তারই মর্মস্পর্শী বিবরণ দিয়েছেন উপন্যাসিক অমিয়ভূষণ মজুমদার। ... উপন্যাসে দু ধরণের চরিত্র আছে - এক সমাজের নিম্নতম শ্রেণীর, দুই জমিদার ও তার পরিবার এবং জমিদার গোষ্ঠীর মানুষ। নিম্নতম শ্রেণীর জীবন-যাত্রার সঙ্গে জমিদার ও জমিদারগোষ্ঠীর মানুষদের পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াবার চেষ্টা, নিম্নতম শ্রেণীর হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে মানুষের অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত হওয়া, লালসা অর্থাভাবে মেয়েদের দেহব্যবসা গ্রহণ, প্রেম আকর্ষণ ও উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির ভাব উপন্যাসিক বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে লক্ষ্য করেছেন। উপন্যাসিকের জাগ্রত সমাজচেতনার পরিচয় আছে জীবন চিত্রনে ও মাঝে মধ্যে তাৎপর্যবাহী মন্তব্যে।''[৫] ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় 'কালের প্রতিমা'[৬] ও 'সাহিত্য সন্ধান' গ্রন্থে লেখক সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনায় অমিয়ভূষণ এক স্বতন্ত্র্যবাদী উপন্যাসিক। কলকাতা থেকে বহুদূরে উত্তরবাংলার নিবিড় শাল সেগুনের সান্নিধ্যে বাস করে এই সাহিত্য সাধক নিরলস প্রয়াসে সাহিত্য সাধনায় মগ্ন আছেন। জীবন-সন্নিষ্ট আগ্রহী লেখকের সত্তা তাঁর সৃষ্টির ভুবনে

পরিব্যাপ্ত। প্রচারবিমুখ এই বরেণ্য লেখক দীর্ঘকাল একনিষ্ঠতার ও মৌলিকতার স্বীকৃতি হিসাবে ত্রিবৃত পুরস্কার, উত্তরবঙ্গ সংবাদ পুরস্কার, বঙ্কিম স্মৃতি পুরস্কার ও একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন। এবারে আমরা লেখকের জীবন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করবো যা কিনা তাঁর সাহিত্য গঠনের বিভিন্ন সূত্রগুলোকে আমাদের কাছে পরিস্কার করে তুলবে।

অমিয়ভূষণের পরিচয় দিতে গিয়ে প্রথমেই বলতে হয় তিনি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। শোনা যায় এই বারেন্দ্র ব্রাহ্মণেরা মিথিলা থেকে নদীয়া, পাবনা, রাজশাহী ও মালদা জেলায় এসেছিলেন নব্যন্যায় শেখাতে। পিতা অনন্তভূষণ মজুমদার, মা জ্যোতিরিন্দু দেবী। ঠাকুরদা বরদাপ্রসাদ মজুমদার, ঠাকুরমা ভবতারিণী দেবী। একটি বংশতালিকা তৈরী করে লেখকের বংশের পুরো পরিচয়টা জানার চেষ্টা করা যাক -

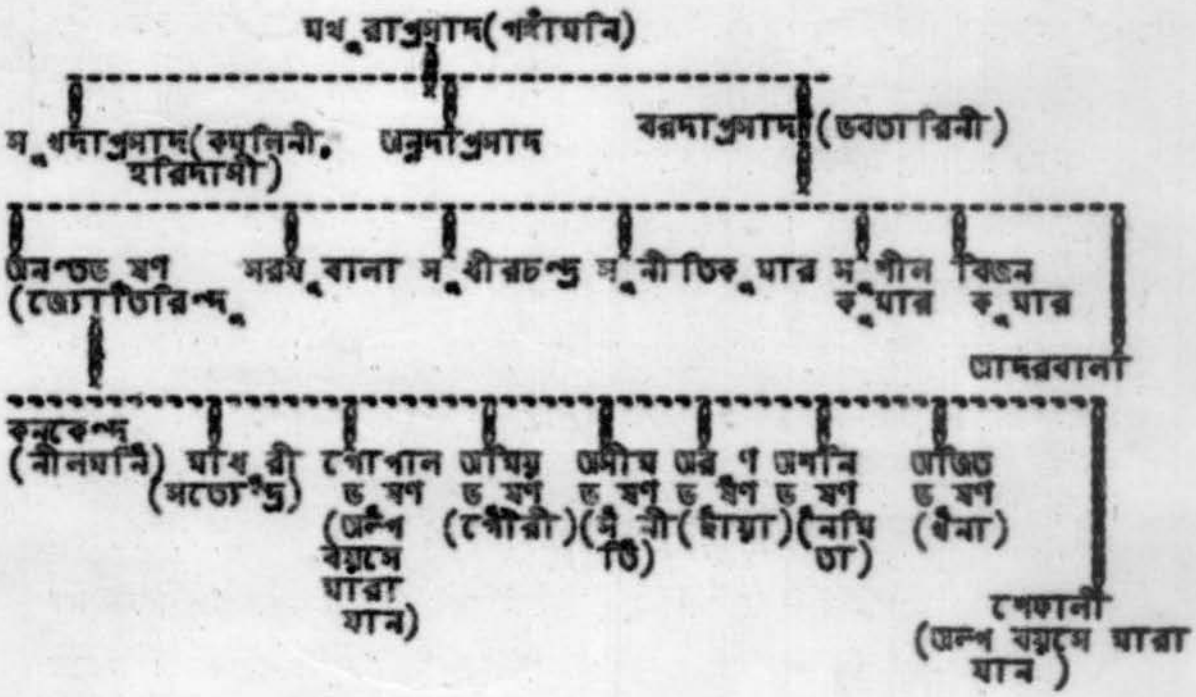

অম্বিকাচরণের পিতৃনিবাস পাবনা জেলার সারা থানার অন্তর্গত পাকুড়িয়া গ্রাম। বর্তমান বাংলাদেশের বিখ্যাত হার্ডিঞ্জ ব্রীজ থেকে মাইল তিনেক দূরে এই গ্রাম। হার্ডিঞ্জ ব্রীজের শেষে একটি রেলস্টেশন রয়েছে তার নাম পাকশি। এই স্টেশনে নেমে তখনকার সময়ে পায়ে হেঁটে কিংবা পাল্কী অথবা গরুর গাড়ীতে চড়ে তাঁদের বাড়ী যাওয়া যেতো। রাস্তায় পড়তো চষা জমি, একটার পায়ের সঙ্গে অন্যটার গায়ে লাগা খড়ের চালার চাষীদের নিচু নিচু বাড়ী, কাঁটাময় বাবলা গাছ, বাঁশঝোপ, ফলের বাগান, দূরে নদীর বাঁক, আরো কত কি। পাল্কী করে বাড়ী যাবার বর্ণনা প্রসঙ্গে আমরা জানতে পারি, ''পদ্মার সমান্তরাল উঁচু কাঁচা পথ দিয়ে বেশ কিছুক্ষণ চলার পর ছোট রাস্তা ধরে পাল্কী চললো। চষা জমি আর কৃষকদের নিচু নিচু বাড়ী, রোদে তপ্ত, আর কাঁটা সর্বস্ব বাবলা গাছ। আরও খানিকটা গিয়ে একদিকে বাঁশঝোপের লাইন চলেছে, অন্যদিকে বাগান। ডানদিকের বাঁশঝোপের পিছনে ঘরবাড়ি, সেদিকে ছোট ছোট গলি। ... পাল্কীটা বাগান ঘুরে বাঁয়ে চললো, এখানে একটার গায়ের সঙ্গে অন্যটার গায়ে লাগা অনেক খড়ের চালার উঁচু নিচু বাড়ী।''[৮] গ্রামে বসতি ছিল নানারকম লোকের। এরা মূলতঃ জমিতে চাষ করতেন। এদের প্রসঙ্গে বর্ণনা পাওয়া যায় xx ''আমাদের গ্রামটায় কৈবর্ত ও মাহিষ্য দাস ছাড়া একজন কায়স্থ বা ব্রাহ্মণ ছিলো না আমাদের বাড়ীর বাইরে। চারিদিকে সব মুসলমান প্রধান গ্রাম। সাহাপুরে কিছু ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও সাহা ছিলো।''[৯] বাবার ঠাকুরদা মথুরাপ্রসাদ পাকুড়িয়ার নীলকর সাহেবদের পরিত্যক্ত একটি বিশাল বাড়ি কিনেছিলেন কিন্তু সেখানে থাকবার মতীর অভাব বোধ করায় সে বাড়ীর অর্ধেকটাই জ্ঞাতিদের দান করে তাদের বাস করার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। এভাবেই মথুরাপ্রসাদের হাতে পাকুড়িয়া গ্রামে মজুমদার বংশের প্রথম পত্তনি হতে পেরেছিলো বলা যায়। অবশ্য পাকুড়িয়ার আগে তাদের বাসস্থান ছিলো যশোরজেলার 'কুড়ুলিয়া বাইটকামারা' গ্রামে। শোনা যায় পূর্বজীবনে মথুরাপ্রসাদ নদীয়া জেলার সদরপুরে রানী পিয়ারীসুন্দরীর দেওয়ান ছিলেন।

বাংলার গ্রামগুলো তখন তার স্বাস্থ্যের প্রাচুর্যে উজ্জ্বল। মাঠে, পুকুরে, বাড়ীতে সব জায়গায় সুখ শান্তির নির্মল আকাশ। কবির ভাষায় বলা যায় - ''এখানে আকাশ নীল - নীলাভ আকাশ জুড়ে সজিনার ফুল।ফুটে থাকে স্নিগ্ধ সাদা - রং তার আশ্বিনের আলোর মতন।আনন্দফুলের কালো ডাঁশুরুল এইখানে করে গুঞ্জরন। রৌদ্রের দুপুর ভরে, বারবার রোদ তার সুচিক্কন চুল।বুলায়ে বুলায়ে খেরে এইখানে জাম লিচু কাঁঠালের বন। ধনপতি, শ্রীমন্তের, বেহুলার, লহনার ইঁদুরেছে চরণ।মেঠো পথে মিশে আছে কাক আর কোকিলের শরীরের ধুল।''[১০] নীলাভ আকাশ মাথার ওপরে ছড়িয়ে পাকুড়িয়া গ্রাম। সেই গ্রামেরই একপ্রান্তে দুর্গাকার গঠন ও বিস্তৃতি নিয়ে এক বিশাল বাড়ী। অনেক শরিকের সেই বাড়ী লেখকের ধ্যান, জ্ঞান ও মুগ্ধ। এমন একটি বাড়ীর গঠন, তার আভিজাত্য সেই ছেলেবেলা থেকে মৃদয় অন্তরালে প্রোথিত হয়ে গিয়েছিলো। তাই তার কথা, ''আর ওই পুরানো বাড়িটাও কোনদিনই মন থেকে বিদায় নিলো না। বোধহয় দিনের কিছু সময় আমার মন সেই অস্ত্র সম্ভার, সেই কাঁচের গ্লাসের সমারোহ এবং ডোম ঝাড় চিমনির বাড়িটাতে নিয়মিত বাস করে। সেইজন্য বোধহয় অন্তত অংশত আমি ষোড়শ শতকের বাঙালী যে অনায়াসে আপ-আপারী করতে পারে কিন্তু মোটেই meek ও humble নয়। এবং সাহিত্যিক সে বাজারে আনতে পারে না, entertainer মনে করতে লজ্জায় মরে যায়, পত্রিকার সম্পাদককে আত্মীয় জ্ঞান করে না।''[১১] নিজেদের বাড়ীর বিশালতা তার গাম্ভীর্য দিয়ে তাকে বিমুগ্ধ করে ফেলেছিল যার সুন্দর বর্ণনার ভেতরে আছে, ''আমার শৈশবের চোখে নীলকুঠির সেই দুর্গাকার বিস্তৃতি ও গঠন, আধইঞ্চি পুরু লোহার পাতের দশ এগারো ফুট দরজাগুলো, একহাত উঁচু বাঁধানো নীল চৌবাচার দেয়ালগুলো যার উপরে আরও ফুট

পাঁচেক পেঁথে তুললেই অনায়াসে হলঘর, শোবার ঘর ইত্যাদি করা যায়, আর তা না করলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের খুঁড়ে বার করা পরিচ্ছন্ন ধ্বংসাবশেষের সাজানো গোছানো এক্জিবিট, যার ফলে দুর্গের কল্পনাটাই বাড়ে, পুরনো দু একটা তরোয়াল, ঢাল, ঢোলকাকার ঢাকাকার, প্রকাণ্ড করবীফুলের আকার কাচের চিমনিগুলো, দু তিন কেজি তেল ধরে এমন প্রকাণ্ড পিংকসের হারিকেন লণ্ঠন - এসবই অবাক হওয়ার মতো বোধ হতো ।··[১২] ··আমি দাঁড়িয়েছিলাম যেখানে সেটা একটা কোয়াড্রাঙ্গল । আমার সামনে উঁচু দেয়ালের মধ্যে বসানো জানালার সারি, তার মাঝখানে সেই প্রকাণ্ড তামাটে দরজা । আমার বাঁ হাতের দিকে সাদা দেওয়ালের টিনের ছাদের লম্বা একসারি ঘর । আমার ডান হাতের দিকে একসারি । তাদের সামনে লাল বাঁধানো টেরাস । টেরাস শেষ হয়েছে ছ ফুট উঁচু প্রাচীরে । পরে এগুলোর নাম জেনেছিলাম - সাদা দেওয়ালের ওটা কাছারী, লাল দেওয়ালের ওটা তোশাঘর আর উঁচু বাঁধানো লাল টেরাসকে বলা হত হৌস ... এই কোয়াড্র্যাঙ্গেলের [illegible] পশ্চিমে আর একটা কোয়াড্র্যাঙ্গল একটা উঁচু টেরাস আবার লাল রঙের পশ্চিমের দেয়ালের গায়ে । পাতকুয়োর দিকে উঁচু প্রাচীর । দক্ষিণে উঁচু হবিষ্য ঘর । ... পুকুর তার ওপারে বাগান ।··[১৩] গ্রামের বাড়ী তাঁকে এত আকর্ষণ করলেও এই বাড়ীতে কিন্তু তিনি জন্মান নি । তিনি জন্মেছিলেন ১৯১৮ সালের ২২শে মার্চ(৮ই চৈত্র ১৩২৪) মাতুলালয় কোচবিহার শহরে । বাংলামতে শুক্রবার আর ইংরেজীতে শনিবার । বাংলাদেশের সে সময়কার রেওয়াজ অনুযায়ী গর্ভবতী মেয়েরা তাদের ভাবী সন্তানকে প্রথম পৃথিবীর আলো দেখাতে পিতৃগৃহে আসতেন । সে হিসেবে জ্যোতিরিন্দু দেবীও এসেছিলেন অমিয়ভূষণের জন্মের আগে তাঁর পিতৃগৃহে । বাবা রামনারায়ণ চৌধুরী কোচবিহারের প্রথিতযশা

আইনজীবি ছিলেন, একমাত্র মামা রমেশনারায়ণ চৌধুরীও আইনব্যবসা করতেন। কোচবিহার তখন মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণের শাসনাধীন। সেই মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ যার সম্বন্ধে গল্প আছে যে তাঁর শাসনকালে একবার কোচবিহার রাজ্যে প্রচণ্ড খরা হয়েছিল ফলে সেবার গরীব প্রজারা খাজনা দিতে পারে নি। খাজনা আদায় না হওয়ায় অনেক প্রজাকে মাল কাছারীতে ধরে নিয়ে আসা হলো। কোচবিহার স্টেটের রেভিনিউ অফিসার তাদের গ্রেপ্তার করলেন। প্রজারা তাদের প্রকৃত অবস্থা জানাতে না পেরে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলো। খবর পেয়ে মহারাজ জিতেন্দ্রনারায়ণ তাদের কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রজারাতো অবাক বিস্ময়ে। ভাবছে সত্যিই মহারাজা তাদের মারবে। যাহোক সমস্ত শুনে মহারাজ সবাইকে ছেড়ে দেবার হুকুম দিলেন ও সবার দু মাসের খোরাকীর ব্যবস্থা করলেন।[১৪] কোচবিহার উত্তরবঙ্গের এক প্রান্তে অবস্থিত হলেও সে সময়কার বাংলাদেশে তার একটা আলাদা গুরুত্ব ছিলো। কোচরাজাদের শাসনকালে এখানকার ধর্ম, লোকসংস্কৃতি, শিল্পকলা, শিক্ষার বিকাশ প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রভূত পরিমাণে উন্নতি সাধন সম্ভবপর হয়েছিলো। ভাবলে অবাক লাগে যে সেই মধ্যযুগে যখন বাংলাভাষা লোকভাষা বলে শিক্ষিতজন দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছিল তখন কোচবিহার রাজবংশের উৎসাহে বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা ও রাজকার্য পরিচালনা করা হতো। ঐতিহাসিক মিহাবুদ্দিন কোচবিহারের অট্টালিকা, রাজপথ, জলবায়ু এবং পান্থশালার প্রশংসা করে গেছেন। মহারাজা নরেন্দ্রনারায়ণের সময় থেকেই জেনকিন্স হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে আধুনিক শিক্ষার প্রসার শুরু হয়েছিল বলা যেতে পারে। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে মহারাজ নৃপেন্দ্রনারায়ণের প্রচেষ্টায় ভিক্টোরিয়া কলেজ স্থাপিত হয়, তাছাড়া ১৮৮১ সালে নারী শিক্ষার জন্য তিনি 'সুনীতি একাডেমি' প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। জীবন যাপনের

আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়াটি এই শহরে কারো মুখাপেক্ষি না থেকে রাজাদের মুক্ত চিন্তার ফলস্বরূপ অনেক আগেই এসে হাজির হয়েছিল। ছবির মত শহর কোচবিহার। এই শহরেই মাতুলালয়ে জন্মেছিলেন অমিয়ভূষণ। প্রায় আধুনিক এই শহরজীবন তার জীবনে দু হাত প্রসারিত করে দিয়েছিলো। পাকুড়িয়ার বাড়ির তুলনায় মামাবাড়িটি বেশ ছোটোখাটো। বাড়ির মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার মতো বাগান, পুকুর এসবতো ছিলোই না, বাঁধানো সুরকির রাস্তার ধারে খোলামেলা আর আধুনিক। এক মুক্ত পরিবেশে জন্মালেন ভাবীকালের এক মহান স্রষ্টা।

ছেলেবেলার আটবছর বয়স পর্যন্ত মাঝে মাঝেই তাঁকে কখনো কোচবিহার আবার কখনো বা পাকুড়িয়ায় কাটাতে হয়েছে। তখনও তাঁর পৃথিবী তাঁর মায়ের মুখ এবং সুন্দর মার্বলহেন দুখানা হাত। বাবার তত্ত্বাবধানে একসঙ্গে 'ঈশ' আর 'ডু সো টু মি' অর্থাৎ বিদ্যাসাগর আর প্যারীচরণ শুরু হলো। প্যারীচরণ বেশী প্রাধান্য পেয়েছিলো। ১৯২৬ সাল লেখকের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ। একটি ঘটনার উল্লেখ করে লেখক বলেছেন, ''আমার এক ভাইয়ের চিকিৎসার জন্য পাকুড়িয়া থেকে পাবনায় যাচ্ছিলাম আমরা। পদ্মা বেয়ে স্টিমারে। সন্ধ্যায় পৌঁছে যাওয়ার কথা। ঝড় উঠেছিলো, গোটা রাত এক আতঙ্কের আবহাওয়ায় কাটিয়ে ভোররাতে পাবনায় পৌঁছে-ছিলাম। সেই ঝড়ের ধাক্কা যা যেন স্টিমারকে শূন্যে তুলে ফেলবে, যা এক অদ্ভুত কারণে একই সঙ্গে রাগে গজরাচ্ছে আর আর্তনাদ করছে, সেই বৃষ্টিধারা যা পৃথিবী থেকে স্বর্গ পর্যন্ত একটা নীলচে সাদা দেয়াল, সার্চলাইট যার এখানে ওখানে পড়ে যেন পালিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজছে, স্টিমারের সেই ভাঙা-গলার আর্তনাদ। ভীত ত্রস্ত যাত্রীদল যারা আতঙ্কে ছোটাছুটি করে স্টিমারের ভারসাম্যকে টলিয়ে দিচ্ছে

আরও, যাদের স্থির রাখতে মৃদু লাঠি চালনা করছে মাল্লারা, তারা নানা প্রার্থনা করছে। দোতলার ডেকে তখন যা বললেন, যদি সত্যি ডোবে। বাবা গম্ভীর মুখে বললেন, আবার সাঁতরে পার হতে হবে পদ্মা। তখন সেই ডেকে একটা চাদর বিছিয়ে মাকে ধরে আমরা চারভাইবোন শুয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভেঙেছিলো ভোর হলে পাবনার ঘাটে পৌঁছে। সেই ঝড়ে পদ্মায় কারো পক্ষেই চারটি শিশু ও তাদের মাকে নিয়ে সাঁতরে পার হওয়া সম্ভব হতো কিনা জানিনা। কিন্তু আমার একটা প্রত্যয় আছে পুরুষের ইশ্বর-নির্দিষ্ট একটাই যুক্তি- আছে অস্তিত্বের সন্তানদের রক্ষা করা। প্রত্যয়টা সেই রাত থেকে উঠেছে।''[১৫]সে সময় কিছুদিন তাদের পাবনায় কাটাতে হয়েছিলো। সেখানে এক মাইনর স্কুলে(মহাকালী পাঠশালা) তাঁকে বাবা ভর্তি করতে নিয়ে গিয়েছিলেন কিন্তু বাংলা জ্ঞানের অভাবে ক্লাশ থ্রি'তে ভর্তি হওয়া হলো না। অথচ ক্লাস টু ইংরাজী পরীক্ষার সময়ে হঠাৎই ক্লাস থ্রি'তে ভর্তির পরামর্শ দিয়েছিলেন মাস্টারমশাই। সেই স্কুলেই মাস দুয়েক পড়বার সময় তিনি শিব পূজা শিখেছিলেন আর এমন একজন বান্ধবী পেয়েছিলেন যিনি সারাজীবনে তার বিভিন্ন গল্পে ভিন্ন ভিন্ন পোষাকে এসেছেন। এই বান্ধবীর সাথে সাজাদপুরে লেখকের পরিণত বয়সে দেখা হয়েছিল। তখন অবশ্য তিনি সম্পর্কে লেখকের কাকিমা। এই পাঠশালায় একজন শিক্ষক ছিলেন, নাম যতীন ভট্টাচার্য। ইনি একটি হস্তুর স্তোত্র রচনা করেছিলেন, বিদ্যালয় শুরুর আগে ছাত্রছাত্রীরা সেই স্তোত্রটি আবৃত্তি করতো - ''যৌনো চন্দ্রদলম্, গলে চ গরলম্, জটে চ গঙ্গাজলং, ব্যালং বক্ষসি, চান্দ্রং চ নয়নে, মূলং কপালং করে।''[১৬] পাবনায় থাকাকালীন লেখক কঠিন অসুখে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের কথা, ''কিন্তু পাবনাতে গিয়ে অসুখে পড়লাম আমি। পরে তা এমন হলো যে

কলকাতার ট্রপিক্যাল হাসপাতালে ভর্তি হতে হলো । একথা বলার একটাই যুক্তি থাকতে পারে । এখানে ইংরেজদের প্রথম সংস্পর্শ সংস্পর্শ হয়েছিলো আমার মনের সঙ্গে । কর্ণেল নেপিয়ার ডাক্তার । আমার সেই পার্কপাড়ার ওয়ার্ডের দশ নম্বর বিছানার ধারে যিনি টুল নিয়ে বসতেন সেই বিশ বাইশ বছরের লাল চুলের ঝকঝকে দাঁতের টোল খাওয়া এক নার্স । কর্ণেল নেপিয়ারকে তখনই বুঝতাম, সবাই বাঘের মতো ভয় করতো । কিন্তু সেই নেপিয়ার কেন আমাকে একটু স্নেহ দিয়েছিলেন তা জানি না । কিছু সফেদ রঙের ছ'সাত বছরের একটি ছেলে, যে প্রথম দিনেই তাঁর সঙ্গে ইংরেজীতে কথা বলার চেষ্টা করেছিলো এ জন্যে ? আর সেই নার্স সিস্টার ... যেদিন Spleen puncture এর যন্ত্রনায় আমি মুমূর্ষু, জোরে কাঁদবারও উপায় নেই, কারণ সেদিনই আমার উল্টো দিকের বিছানার একজন স্বর্গে চলে যাচ্ছে, সেই নার্স আমাকে চামচ করে খাইয়ে দিয়েছিলেন : নরম স্ক্র্যাম্বল্ড এগের সঙ্গে নরম পাউরুটির শাঁস । তারপরেওতো তিনি চলে যাননি । সকালে ঘুম ভাঙলে দেখেছিলাম তিনি বসে আছেন । বিকেল থেকে পরের দিন সকাল পর্য্যন্ত কারো একটানা ডিউটি থাকে না । যাই হোক, এই জন্যই আমার ধারণা হয়ে যায় ইংরেজরা আমাদের মতোই মানুষ । ঝগড়াও লড়া যায়, ভালোবাসাও যায় । রাক্ষসও নয় দেবতাও নয় : ফলতঃ আমি তাদের সামনে কোন কমপ্লেক্স দ্বারা পীড়িত নই । অনায়াসে তাদের ভাষার গঠনবিধি আমার ভাষাতে আনতে পারি, বীফ, মদ ও পোষাককে বাদ দিয়ে, তাদের কালচারে কতটুকু ফিলিস্টাইনত্ব তা বুঝতে পারি, হঠাৎ কোন ম্যাজিকে সেকাল ফিরে এলে আমি বরং রাজবল্লভ, নন্দকুমার হতে চাইব, আর ম্যাজিক যখন কাল নিয়ে এগোবে ডিরোজিও না হয়ে রামমোহন হতে চাইবো । জোব চার্নক বনিতা লীলা যে

কালচারের গার্ডিয়ান সেন্ট ডিরোজিও যার প্রথম অবতার তাকে অবজ্ঞা করাই আমার স্বভাব, যদিও ডিরোজিও বংশধরেরা সমাজে প্রবল।''[১৭] এই উপলব্ধির জন্যই হয়ত লেখকের ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি ভালোবাসা এত দৃঢ় হয়েছে, তাইতো বুঝি তিনি বিশ্বাস করেন যে শোষন ব্যবস্থার অংশ হলেও, তার হিস্যাদার হলেও মানুষের ভ্যালুস এবং মর্যালিটিকে শোষন ব্যবস্থার সৃষ্টি বলা যায় না সবক্ষেত্রে। হাসপাতাল থেকে ফেরার পর ১৯২৬ সালেই এমন আর একটি ঘটনা ঘটলো যার প্রভাব লেখকের জীবনে সুদূরপ্রসারী। এ প্রসঙ্গে অমিয়ভূষণ মন্তব্য করেছেন, ''১৯২৬- এই বোধহয় চনচনের কালিবাড়ী আক্রান্ত হয়েছিল। ঢাকাতে দাঙ্গা হচ্ছিল। আমাদের গ্রামে সেই দাঙ্গা এসে পড়তে পারে এরকম সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছিলো। বড়দের ক্রোধ ও আশঙ্কার আলাপ শুনছিলাম। রামদা, তরোয়াল, সড়কিতে ধার পড়ছিলো। বাবা বন্দুক কিনে আনলেন, কয়েক বাক্সো পিতলমোড়া বুলেট। অনেকদিন রাতে বাবা বন্দুক হাতে গ্রাম ঘুরতে বেরোতেন। শুনতাম ওরা হিন্দুদের কেটে ফেলে, হিন্দু মেয়েদের চুরি করে। মার মুখ শুকনো, বাবার মুখ গম্ভীর। কখনও নিজেদের টডের গল্পের রাজপুত মনে হতো। ১৯৪৬-৪৭ পর্যন্ত এরকম একটা বিদ্বেষ ও ক্রোধ ছিলো মনে। ফলত সেই সব রাজনীতিক যারা দেশভাগের জন্য কংগ্রেস দলকে দোষ দিয়ে উদ্বাস্তু ভোট টানবার প্রয়াস করে চলেছে তাদের চিন্তাকে মিথ্যাশ্রয়ী মনে হতে থাকে।''[১৮] ১৯২৭ সালে তিনি পাবনা থেকে মামা রমেশ নারায়ণ চৌধুরীর সাথে কোচবিহার চলে এলেন স্কুলে ভর্তি হতে। স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায় যে এই পরিবর্তন তাঁর জীবনে একটা চরম রূপান্তর নিয়ে এলো। গ্রাম থেকে শহর, নীলকুঠির বিত্তহীন বনেদিয়ানার চাইতে নিম্ন মধ্যবিত্তের আধুনিকতা তাঁরা পছন্দ করে নিলেন। কোচবিহারে এলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় হয়

যে যুগে সমস্ত উত্তরবঙ্গে জেন্কিন্স স্কুলের মতো আধুনিক স্কুল আর ভিক্টোরিয়া কলেজের মতো ভালো কলেজ ছিলো না। একটি বর্ণনা থেকে জানতে পারি, ''ছোট করদ মিত্র রাজ্য কোচবিহার তখন ছিলো শান্তির নীড়। সারা বাংলা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অগ্নিদহনে পুড়ে ছাই হয়েছে, কুচবিহার ছিল অক্ষত। সাম্প্রদায়িক হানাহানিতে বাংলার আকাশ বাতাস কলঙ্কিত হয়েছে, কুচবিহার দিয়েছে সম্প্রীতির বাণী। আমাদের জেনকিন্স স্কুলটিও ছিল শান্তিময় কুচবিহারের একটি কিশোর প্রতীক। আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে হিংসা কলহ দ্বন্দ্ব তেমন প্রকট ছিল না বলে আমাদের ছেলেবেলাটা কেটেছে পরম শান্তিতে।''[১১] ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই কোচবিহার সম্বন্ধে জানা যায় ''ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে ভারতে ইংরেজ রাজত্ব স্বীকারে কোচবিহার স্বাধীন মিত্ররাজ্য ছিল। রাজ্যের নিজের আইন, নিজের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, নিজের শান্তিরক্ষা ব্যবস্থা সবই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। ইংরেজ সরকার কোন Resident এখানে রাখতেন না। একজন ইংরেজ রাজকর্মচারী এখানে Superintendent of State থাকতেন। তিনি স্টেটের বেতনভোগী কর্মচারী ছিলেন এবং স্টেটের কোনো দপ্তর তাঁর পরিচালনাধীনে থাকতো। তখন কোলকাতা থেকে ইংরেজ রাজত্বের উপর দিয়ে কোচবিহারে যাতায়াতের পথ সুগম ছিল না। প্রথমে দামুকাদিয়া ও সারাঘাট মধ্যে পদ্মানদী বড় স্টিমারে পার হতে হতো তারপর পার্বতীপুর স্টেশনে লাইন বদল করে কাউনিয়া এসে ছোট স্টিমারে তিস্তানদী পার হয়ে পুনরায় শিতালদহ স্টেশনের প্রায় নীচে ধরলানদী এবং কোচবিহারের নীচে তোরষানদী দেশী নৌকায় পার হয়ে কোচবিহার নগরে পৌঁছুতে হতো। পৌঁছে কিন্তু মন আনন্দে ভরে উঠতো এক মনোরম, পরিচ্ছন্ন, আনন্দময় নগর দেখে। কোচবিহার নগর নকশা

করে ৠ তৈরী করা, শিল্পীর শ্রী ও সৌন্দর্যজ্ঞানের স্বাক্ষর। অবিভক্ত বাংলার কলকাতার বাইরে এমন মনোরম জনপদ কোথাও ছিল না। রাস্তাগুলি সবই ঋজু, দুপাশে বৃক্ষরাজী শোভিত, এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত দৃষ্টিপথে পড়ে। কাঁচা রাস্তার সংখ্যাই বেশী ছিল, কিন্তু রাস্তাগুলির গঠন এমন চমৎকার ছিল যে সারা রাত ধরে ১০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাতের পরও সকালে জুতাপায়ে চলতে অসুবিধা হতো না। রাজপ্রাসাদ শোভায় অতুলনীয়। স্টেটের বাড়িগুলি সব পাকা হলেও সাধারণতঃ গৃহস্থবাড়িগুলি টিনের বা খড়ের ছাদ দেওয়া থাকতো। তবে সেগুলো বেশ শোভন ও স্বাস্থ্যকর ছিলো। স্বচ্ছসলিলা ৠ ৠৠৠৠ দীঘিকাগুলি জল সরবরাহ করা ছাড়া নগরের শোভা বর্ধন করতো। তার মধ্যে 'সাগরদীঘি' ছিল আয়তনে বিশাল এবং সৌন্দর্যে অপরাজেয়। এটি প্রদক্ষিণ করে সান্ধ্যভ্রমণ আনন্দদায়ক ও স্বাস্থ্যপ্রদ ছিল। এই ছিল নগরের বাহিরের রূপ। নাগরিক জীবনের রূপও ছিল সমান সুন্দর। স্থানীয় অধিবাসীদের মধ্যে রাজগণরা নগরের অল্প পরিধি নিয়ে বাস করতেন। পুরাণো বাসিন্দা খাগরাবাড়ির ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা নগরের বাহিরে নিরালায় বাস করতেন। নগর গড়ে উঠেছিলো পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গ থেকে নবাগত লোক নিয়ে। তাদের মধ্যে জন্মগত সমাজবন্ধন ছিল না। প্রীতি ও বন্ধুতার বন্ধনই ছিল বড় বন্ধন। প্রায় সকলেই নিজ বাড়ি তৈরী করে নিয়ে বাস করতেন। সামাজিকতা, জমাজমি বা জীবিকা অর্জন নিয়ে তাঁদের মধ্যে বিরোধের কোন কারণ ছিল না। কোনরকম নির্বাচন দ্বন্দ্ব ছিল না। 'টাউন কমিটি' আখ্যায় একটি পৌরপ্রতিষ্ঠান ছিল বটে, তবে সেটি সরকার মনোনীত সভ্য দিয়ে পরিচালিত হতো। তাছাড়া প্রায় সকলেরই কমবেশী যা উপার্জন ছিলো তাতেই সংসার চলে যেতো। এ অবস্থায় নগরবাসীদের মধ্যে দ্বেষ হিংসা, মনোমালিন্য বা দলাদলি কিছুই ছিল

না বা থাকার কারণও হতো না। আপদে বিপদে পরস্পর পরস্পরের নিকট অকুণ্ঠ সাহায্য পেতো। দৈনন্দিন কাজের পর কেউ খেলাধুলা নিয়ে, কেউ গানবাজনা নিয়ে, কেউ পড়াশুনো করে, কেউবা গল্পগুজব করে সময় কাটাতো। ক্ষুদ্র গন্ডী অতিক্রম করে উদার গন্ডীতে বিচরণ করায় অনেকের মন আপনা আপনি শিক্ষিত হয়ে যেতো।"[২০] এই রকম ঐতিহ্যপূর্ণ শহরে এসে জেনকিন্স স্কুলে তিনি ভর্তি হলেন - একেবারে ক্লাশ ফোর। এ সময়ের তাঁর অনুভূতি তাঁর ভাষাতেই বলা যাক, "আমি যা অনুভব করতাম তা সুখ। তার কারণ দাদামশায়, দিদিমা এবং মামার ভালোবাসা স্কুলের বন্ধু-বান্ধবদের ভালোবাসা আর যেন চারিদিকের রঙিন আলো আলো ভাব। এখন ভাষা দিতে পারি আমার সেই অব্যক্ত প্রীতির, তাই বলতে পারি এখন শহরের আধুনিকতা, আমার দাদামশায় আর মামা দুজনেই উকিল যা জমি জিরাত খাজনা আদায়ের তুলনায় আধুনিক, যাঁদের কাছে সময়ের দাম ছিলো, বাড়ির সকলের বই পড়া, কাগজের খবর রাখা, আদালত কোর্ট, সরকারি অফিস, রেলস্টেশন, হাটবাজার স্কুল কলেজ, ব্রাহ্ম মন্দির, পথে ব্যস্তসমস্ত মানুষের যাতায়াত, ঘোড়াগাড়ি, কুচিৎ মোটরগাড়ি, বড় বড় সুন্দর ঘোড়া, হাওদাদার হাতি, রাজবাড়ির মারফৎ ১৯২৭ এই ১৯২৭ এর লন্ডনের হালচালের গন্ধ ছড়িয়ে পড়া, দিদিমার বই পড়া, বই লেখা, সভা সমিতি করা, ব্রাহ্ম মন্দিরে যাওয়া, তাবিজ কবজ মানত না মানা, ঈশ্বর আছেন কিংবা নেই, থাকলে তাঁর চেহারা আছে কি না এসব আলাপ, মামার সঙ্গে বসে সেই ১৯২৭ এই রবীন্দ্রনাথের গান শেখা, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে অতুলপ্রসাদ, ডি.এল. রায়ের গানও, আর স্কুল কলেজ, বেলা দশটায় ছাত্রছাত্রীতে পথঘাট ভরে যাওয়া, আর ক্রিকেট টেনিস। আর এইসব আধুনিকতার সঙ্গে যা চোখে লেগেছিলো তা

UNIVERSITY LIBRARY
RAJA RAMMOHUNPUR
106515
28 NOV 1990

সৌন্দর্যরূপ। সোজা সোজা, প্ল্যান করে পাতা লাল সুরকির পথ যার দু'পাশে বড় বড় গাছ পথগুলোকে বীথি করে রেখেছে। সেই যে রূপের ফাঁদে পড়া তার থেকে আর মুক্তি নেই।''[২১]

১৯২৯ সালে পাবনা থেকে বাবা, মা, পরিবারের সবাই কোচবিহারে চলে এলেন। এবার বাবার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে লেখাপড়া চলতে থাকলো। দিনের চার ঘণ্টা লেখাপড়ার সময়ের তিন ঘণ্টা ইংরাজী আর অংক, বাকি এক ঘণ্টা বাংলা ভূগোল, ইতিহাস, ড্রয়িং। ফলে বাংলা, ইতিহাস এবং ড্রয়িং'এ খুব বাজে নম্বর পেতেন। ক্লাশ সিক্সে পড়ার সময়েই এমন একজন শিক্ষকের সান্নিধ্যে তিনি এলেন যিনি তাকে বাংলা শিখতে প্রচুর সাহায্য করেছেন। ইনি হলেন তৎকালীন জেনকিন্স স্কুলের উমাকুমার দাস। স্মৃতিরোমন্থন করতে গিয়ে অমিয়ভূষণ তাই লেখেন, ''এই ক্লাসেই আর একটা অভিজ্ঞতা হয়েছিলো। আমাদের সময়ে সাপ্তাহিক পরীক্ষা হতো। অংক কষাতেন উমাকুমার দাস মশাই। ভদ্রলোকের মিষ্টিকথা আমাদের ভালো লাগতো কিন্তু প্রথম অংকের ম পরীক্ষায় আমি পাঁচ পেলাম। খুব দুঃখ হলো মনে। বনবাসে যাবো স্থির করে ফেললাম। রবীন্দ্রনাথের 'সেথায় হবো বনবাসী' কবিতাটা পড়া ছিলো। স্কুল থেকে বেরিয়ে আর্টিজান স্কুলের পাশ দিয়ে ঘেঁটো পথে(তখন ঘেঁটো পথ ছিলো - পথের ডানদিকে জঙ্গল ছিলো) পার্কে গিয়ে পৌঁছালাম। একটা বেঞ্চি দখল করে বনবাসের ব্যবস্থা করে নিলাম। কিন্তু মামাবাড়ির কর্মচারীরা বেরিয়ে পড়েছিলেন। শনিবার বেলা তিনটে পর্যন্ত আমি অনুপস্থিত। তাঁদের একজনের কাছে আমি ধরা পড়ে গেলাম। এরপর থেকে অংক আমাকে ভর করলো - যাদব চক্রবর্তী মশায় এলেন তাঁর গ্রন্থরূপে। সে কি দুর্জয় বোঝা। পাঠ্যজীবনে অংক আর আমাকে ছাড়লো না। ... আর গৃহিনী যখন এলেন শুনলাম তিনি যাদব চক্রবর্তী মশায়ের আত্মীয়া। এইটুকুই

এখন মাস্টার চক্রবর্তী মশায়কে এখন দাদামশায়ের মতো মনে হয়। কিন্তু ঊষাবাবু ও আমার অঙ্কের যোগ এখানেই শেষ নয়।''[২২]

''একদিন দেখলাম পাঠ্যপুস্তক 'মণিমালা' নিয়ে আমাদের ভূতপূর্ব অংকের মাস্টারমশাই এলেন। বিরক্তবোধ হলো কারণ ইতিমধ্যে 'মণিমালার' খানিকটা পড়ে ফেলেছি বাড়িতে। কবিতাগুলি বিশেষ করে ভালো লেগেছে। তারই কিনা এই দুর্গতি যে অংকের মাস্টার মশাই পড়াবেন? কিন্তু অবাক হলাম। কি সুন্দর কণ্ঠ। কি মধুর কবিতা পাঠ। ঊষাকুমার দাস মশায়কে আমার মন অংক থেকে সাহিত্যে প্রমোশন দিতে রাজী হলো। এটাকেই তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় বলবো। অংকে যিনি আমাকে পাঁচ দিয়েছিলেন তিনি আমার উপকার করেছিলেন কিনা তা আগেই বলেছি। তিনি মাস্টার-মশাই ছিলেন, গুরু নন। 'মণিমালায়' হাতে ঊষাবাবু আমার গুরু হলেন।

ঊষাবাবু পক্ষপাতিত্ব করতেন। আর গুরুরা তা করেও থাকেন। ঘটনাটা বলি। উইকলি পরীক্ষা বাংলার। পঞ্চাশের নম্বরের পাঁচটি প্রশ্ন। শেষ প্রশ্ন রচনা। গরু অথবা রামমেলা, তার নিচে একটু যেন বড় বড় অক্ষরে অথবা লিখে তার নিচে লেখা আছে - 'চন্দ্রালোকে বন্ধুর সঙ্গে ভ্রমণ'। হাতে লেখা প্রশ্ন। লেখার তারতম্যের জন্যই হয়েতো আমার ধারণা হয়েছিলো 'চন্দ্রালোকে বন্ধুর সঙ্গে ভ্রমণ' এই রচনাটি পাঁচটি প্রশ্নের পরিবর্তে লেখা যেতে পারে। এটা ভুলই হয়েছিলো আমার। পরীক্ষার সবটুকু সময় ধরে চন্দ্রালোকে ভ্রমণ করে বেড়ালাম। পরীক্ষার ঘর থেকে বেরিয়ে কান্না এলো। দশ নম্বরের উত্তর দিয়ে কতই বা পাব? তাও আবার চলতি বাংলায় লেখা। ত্রিশ্যাপদে'য়' যোগ করতে আমার চিরদিনই আপত্তি। আবার পাঁচ পেতে হবে, যেমন ঊষাবাবুর কাছে অংকে পেয়েছিলাম। কিন্তু

ঊষাবাবু সে পরীক্ষায় আমাকে পঞ্চাশে উনপঞ্চাশ দিয়েছিলেন। ওই এক নম্বর বোধহয় গুরুর প্রণামী। একে পক্ষপাতিত্ব বলছি এই জন্যে বাংলায় কোনদিন আমি এত নম্বর পাইনি। একশোর মধ্যে সব প্রশ্ন লিখে উনপঞ্চাশ পেয়েছি কিনা সন্দেহ। কারণ ক্রিয়াপদে'য়' না থাকায় আমার বক্তব্য পরীক্ষকদের কাছে অগ্রহণযোগ্য ছিলো চিরদিন। ... ক্লাশ নাইনের হাফইয়ারলি পরীক্ষায় বাংলার প্রশ্নপত্র দেখুন। অপঠিত বিষয়ের সারমর্ম লিখতে দিয়েছেন তিনি। এক নম্বরে দেখতে পাচ্ছি 'শাজাহান' কবিতার একটি স্তবক, অন্যটিতে শ্রীকান্ত চতুর্থপর্বের বৈষ্ণবী কমললতার চরিত্র বর্ণনা। পরে ঊষাবাবু আমাকে যা বলেছেন তার সারমর্ম এই, তারাপদর একহাত উঁচু বলে কি তার জন্য টিনের ছাদ এঁটে আকাশকে তার মাপ মতো করে দিতে হবে? ''যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক্ শুধু থাক্ একবিন্দু নয়নের জল'', এ নিশ্চয়ই আকাশের উদারতার সামনে আমাদের দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল।''[২৩] প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীসুবোধকুমার চক্রবর্তী ঊষাবাবুর সম্বন্ধে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে লিখেছেন ''প্রথম শ্রেণীতে আমরা তাঁর কাছে বাঙলা পড়েছি। কিন্তু বাড়িতে তিনি আমাকে চার পাঁচ বছর পড়িয়েছিলেন। পড়া ছাড়াও আরও কিছু শিখিয়ে ছিলেন বলে তাঁর নামটা আলাদা করে বলতে হচ্ছে। আমি জানি যে আজ যাঁরা কিছুমাত্র লেখবার অভ্যাস রেখেছেন, তাঁরাই আমার মতো আলাদা করে তাঁর কথা লিখবেন। ... আজকের অনেক বড় লেখকের সাথে তিনিই আমায় পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। স্কুলে বলতেন আজ প্রবাসীতে কিংবা ভারতবর্ষে একটা ভাল লেখা বেরিয়েছে, খেলার পরে আসিস। ... শুধু আমি নয়, আমার মতো আরও অনেকে আসত। বনফুলের লেখা গল্প পড়েছি, পড়েছি বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের গল্প। আমার স্পষ্ট মনে আছে। মাস্টারমশাই বরযাত্রী গল্প পড়ে বলেছিলেন

ইনি খুব বড় লেখক হবেন । শুধু বিভূতিভূষণ কেন, আরও অনেকে তাঁর বিচারকে সত্য বলে প্রমাণ করেছেন ।''[২৪] ১৯১১ সালে তিনি যখন ক্লাশ এইটে পড়েন তখন স্কুলের পাঠ্যক্রম মনে স্বপ্ন ঢুকিয়ে দিতে শুরু করেছিল । কারণ এ ক্লাশেই ল্যাম্ব, টেলস ফ্রম শেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ প্রথম খণ্ড ও কথা কাহিনী পাঠ্য ছিলো । ল্যাম্বের সঙ্গে Children's Garland of Verses বলে একটা কবিতা সংকলন । তাছাড়া রোমিও জুলিয়েট, টুয়েলভ নাইট এবং ম্যাকবেথ পড়ানো হয়েছিল । কিন্তু এ বছরই ম্যালেরিয়া ধরলো তাকে । অবস্থা এমন হলো যে মx পরীক্ষাটি পর্যন্ত দিতে পারলেন না । জীবনে প্রথম প্রেমের মতন প্রেমের কবিতার পাঠক হওয়াও এক আশ্চর্য নরম অভিজ্ঞতা । বুকের মণিকোঠায় তার জায়গা চিরকাল অমলিন । অমিয়ভূষণের বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি, ''...নিবারণ মজুমদার মশায় তখন বোধ হয় সদ্য বি.টি. পাশ করে এসেছেন । শার্দুলপ্রতিমxx তাঁর চেহারা । পাঠ্যবিষয় ইংরেজি । গুহা এবং জাগুয়ারের গল্প । পেশীশক্তির পরাকাষ্ঠা । দাঁতের দাগ বসে যায় বন্দুকনলের ইস্পাতে । হাত দিয়ে মাথা ঢেকে সে বৃষ্টি থেকে নিজেকে রক্ষা করে । সন্তানসন্ততি যখন গাছের ডালে ঘুমায় সে তখন গাছের গোড়ায় প্রহরী । গরিলাকে ভালো লাগতো । পাঠ্যবিষয় ও পাঠের উxxx উদ্যোক্তার এমন সমন্বয় কম হয় । গরিলার গল্পের রস প্রচার করতে গেলে শক্তিমান মানুষেরই দরকার । নিবারণবাবুর বলিষ্ঠ বাহুর আন্দোলনের দিকে চেয়ে গরিলার গল্প আমাদের ভালো লেগে উঠতো । কিন্তু নিবারণবাবু আশ্চর্যভাবে আমার কাছে প্রেমের কবিতার পাঠক হলেন - একদিন তিনি পড়ালেন - Her arms across her breast she laid/She was more fair than words can say/ Bare footed came the beggar maid/Before the king cophetua.

... সেখানে কবি কি বলেছেন —

"Cophetua swore a royal oath/This beggar maid shall be my Queen."

দশম শ্রেণীতে পড়বার সময় স্কুলের টিফিন পিরিয়ডে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'সিঁদুরের কৌটা' আর বাড়িতে দিদিমার অনুমতি নিয়ে 'আনন্দমঠ' পড়ে ফেললেন। এ সময়েই আর একটি অনুভব দেখা দিল জীবনে ''স্কুলের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন একটি বিষয় এ সময়ে আমাকে টানতে থাকে। কিম্বা অন্যকথায় জেনকিন্স স্কুলের পরিধি আমার কাছে বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিলো। কেশবাগ্রম, ব্রাহ্মমন্দির, স্কুল ও আমাদের বাড়ি এসব ছিল যেন এক একটা বিদ্যালয়। বিকেলে খেলতাম সঙ্গীদের সঙ্গে, কিন্তু ওরই মধ্যে মন উধাও হয়ে যেতো। কেশবাগ্রমের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম কিছুক্ষণের জন্য, ফিরবার সময়ে বিকেলের পড়ন্ত আলোয় ব্রাহ্মমন্দিরের বাড়িটার পাশ দিয়ে খুব ধীরে ধীরে হেঁটে আসতাম, চেষ্টা করতাম যেন পায়ের জুতো রাস্তার খোয়ার শব্দ না করে। এ কথা এর আগে কাউকে বলিনি, বলতে লজ্জা করতো কারণ বিষয়টা একটা স্বপ্নের মতো কিছু। খুব ছোট বেলায় গ্রিন্স ডিক্টরের বাড়িতে যে আনন্দমেলা হতো তাতে যেতাম। তার স্মৃতিটা মনে আলো হয়ে ছিলো। ইতিমধ্যে দিদিমার সাথে একজনকে আলাপ করতে শুনেছি। আলাপের অর্থ বুঝিনি কিন্তু ধ্বনি আমাকে বিস্মিত করেছিলো। যেন দিদিমা আর তিনি মুখে মুখে কবিতা বলে যাচ্ছিলেন। শুনলাম, তিনি কেশব সেনের মেয়ে। কে কেশব সেন? দিদিমা তাও বললেন। কেশব সেন, দেবেন্দ্রনাথকে স্পর্শ করে দিদিমার গল্প রায়তনু লাহিড়ী মশায়কে ছুঁয়ে হরি ছড়িয়ে পড়লো। দিদিমার বাবা সেকালের মেট্রোপলিটান কলেজের অধ্যাপক

ছিলেন, দিদিমার কাকা ছিলেন রামতনু লাহিড়ী মশায়ের জামাতা। মনের এলকেমির ধরধারণ বিস্ময়কর। কি করে যেন শিশুকল্পনায় রামতনু লাহিড়ী আমার দাদামশায় হয়ে গিয়েছিলেন। ঐ জেনকিন্স স্কুল কেশব সেনের জামাতার সৃষ্টি। সেদিক দিয়েও স্কুল আমার আপন হয়ে উঠলো। মন আমায় বর্তমানকে ছাড়িয়ে অতীতে চলে গেলো। আমি পুরনো দিনের এক আবহাওয়ায় বাস করতে লাগলাম। কিন্তু পুরনো বলেই মৃত নয়। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' নামে বইখানি জোগাড় করা গিয়েছিলো। বইটির মলাট ছিল না, অনেকদিন পর্যন্ত বইটির নাম ও লেখকের নাম আমার অজানা ছিল। কিন্তু শনিবারের বেলা দুটো থেকে চারটে প্রায় ছ'মাস এ বইটি আমাকে খেলা থেকে দূরে রাখতো। রামমোহন রায়কে দেখলাম - কোলকাতার পথে নয়, সাগরদীঘির পার দিয়ে হেঁটে ব্রাহ্মমন্দিরে যেতে। প্রায় দু তিন বছর ধরে আমি এই আবহাওয়ায় বাস করেছি। আমার মন যেন বাঙালি হওয়ার জন্য বাঙালির সেই জন্মমুহূর্তে উদ্দিষ্ট হতে চাইছিলো।''[২৬] দেশজুড়ে তখন বিদেশী রাজশক্তির বিরুদ্ধে যে জনজাগরণের পালা চলছিলো তার প্রভাব তুলনায় কম হলেও এসে পড়লো কোচবিহারে। অত্যাচারীর বিরুদ্ধে মনপ্রাণ গর্জে উঠতে লাগলো। ''সেদিন ব্রাহ্মমন্দিরের কোন সভা ছিল না। বিকেলের ধুলোখেলায় যোগ না দিয়ে একজন মাত্র সঙ্গী নিয়ে ব্রাহ্মমন্দিরের কম্পাউন্ডে ঢুকেছিলাম। কাজ করতে করতে ভাবতে ভালো লাগে। ব্রাহ্মমন্দিরের ঘেরের মধ্যে রবারের গাছ ছিলো। গাছের ত্বক ফুটো করে পাতার রস শুকিয়ে বল তৈরী করছিলাম আমরা। আর ভাবছিলাম আমি। বল তৈরীর কাজটা ক্রমশঃ সঙ্গীর উপরেই চলে গেলো। তখন তত্ত্ববোধিনী সভার সংবাদ জেনেছি। সে কি আমাদের ডেবেটিং ক্লাবের মতোই ছিলো।

ডিরোজিওর ছাত্ররা কেমন ছিলেন ? এসবই তো অতীত । দেবেন্দ্রনাথের যুগ চলে গিয়েছে এখন রবীন্দ্রনাথের যুগ । সেটা অবশ্য আনন্দের কথাই । আর রবীন্দ্রনাথ কবি হলে কি হয়, বেশ শক্ত মানুষও বটে । স্যার উপাধি ত্যাগ করার ব্যাপারই দেখো । আমার চিন্তা এমন সব পথ ধরে উদ্দেশ্যহীনভাবে চলে বেড়াচ্ছিলো । কিম্বা অন্য কথায় একটা স্নিগ্ধ অন্ধকারের নীড় থেকে উঁকি দিয়ে খর আলোকে উদ্ভাসিত বর্তমানের সঙ্গে পরিচয়ের চেষ্টা চলেছিল মনের ।

এমন সময়ে যাদব চক্রবর্তী আমাকে ডাকলো । সে বললো - সে আমার খোঁজেই বেরিয়েছে । বেশ কথা, কি করতে পারি আমি । যাদব আমায় নিয়ে গেলো ব্রাহ্মমন্দিরের দক্ষিণে তাদের বাড়ির পিছনে । ভারি সুন্দর জায়গাটা । চারিদিকে বড়ো বড়ো গাছের মধ্যে শুকনো খটখটে এক টুকরো ঘাসে ঢাকা মাঠ । সেখানে যেন একটা সভা হবে । কিন্তু সাকুল্যে তিনজন আমরা । আমি যাদব, আর চশমা চোখে অপরিচিত এক ভদ্রলোক । সেদিন বেশী আলোচনা হলো না । সেই ভদ্রলোক আমাকে একখানা বই পড়তে দিলেন । বইখানার নাম 'আমার দেশ' । লেখক বোধহয় সখারাম গণেশ দেউস্কর । অদ্ভুত সে বই । হেমন্তের শিশু সর্পকেও ফণা মেলতে আহ্বান করে । আবার সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হলো । গোপন রাখবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে একটা ফটো এ্যালবাম দেখার সুযোগ পেলাম । ক্ষুদিরাম, প্রফুল্ল চাকী থেকে শুরু করে ভগৎ সিং পর্যন্ত । দু এক মাস পরে তিনি বললেন - এখন থেকে তুমি বই পাবে, জিনিসও পাবে । কোথায় পাবে তা বুঝতে চেয়ো না । এমন করে আমরা এক নতুন পথে যাত্রা শুরু করলাম । একদিন খেলার মাঠে কালি আমাকে একটা প্যাকেট দিলো । বললাম - কি । বললো সে - তোমার জন্যে । তখন বিস্মিত হওয়ার উপায় ছিলো না । প্যাকেটটায় কি আছে তা

প্রশ্ন করা নিয়ম ছিলো না । আলোচনা করারতো নয়ই । বুঝলাম শুধু কালিও এর মধ্যে আছে । মনে মনে প্রশ্ন করলাম, কালি আমার আগে, না পরে । বাড়িতে এসে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে প্যাকেটটা খুললাম । হাতে লেখা প্রকাণ্ড মোটা একখানা বই - ''পথের দাবি''। এসবের পরিণতি কি হয়েছিলো, টেগার্ট, লোকনাথ বল, গনেশ ঘোষ প্রভৃতির কার্যকলাপ আমাকে কতখানি উদ্বুদ্ধ করেছিলো, সে অন্য গল্প । কিন্তু রাজা রামমোহন যেমন সতী ছিলেন এক সময়ে, এখন অন্য অনেক সতী হলো মনের ।''[১৭] ১৯৩৪ সালে জেনকিন্স স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ।

জেনকিন্স স্কুলে অমিয়ভূষণের সহপাঠী ছিলেন শ্রী বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী । তাঁর কথা অমিয়ভূষণ আত্মজীবনীমূলক রচনাতে উল্লেখ করেছেন । তিনি অমিয়ভূষণকে ডাকতেন 'গোরা' বলে, এটি অমিয়ভূষণের বাড়ীর ডাকনাম । স্কুল জীবনে ভাল কবিতা আবৃত্তি করতেন তাই অমিয়ভূষণের সাহিত্যপ্রীতি আন্দাজ করা যেতো । তার মনে হতো যে অমিয়ভূষণ যেন নিজস্ব একটা 'হ্যালো' তৈরী করে তার ভেতরে বাস করতে ভালোবাসেন । পরবর্তী সময়ে এই 'হ্যালো'টাকেই অমিয়ভূষণ তাঁর লেখায় নিয়ে এসেছেন বলে তিনি বিশ্বাস করেন । যদিও কিনা সব সাহিত্যিকেরই একটা নিজস্ব পরিমণ্ডল থাকে । প্রচলিত প্রবাহের বাইরে লেখার জন্য, উপমা বহুলতা ও কাব্যিক প্রয়োগের জন্য মিয়ভূষণ অনেকের কাছে দুর্বোধ্য থেকে গিয়েছেন বলে তিনি মনে করেন । স্কুলজীবনের শেষ দিক থেকে রাজনীতির একটা আলোচনা চক্র বসতো, তাতে বইপত্রের আদান প্রদান চলতো । অমিয়ভূষণের সাথে বিভূতিবাবুও সেই আলোচনা চক্রের নিয়মিত সদস্য ছিলেন । উষাবাবুর সাহিত্যপ্রীতি অমিয়ভূষণের পরবর্তী সাহিত্যজীবনের পটভূমি রচনা করেছে বলে তার বিশ্বাস ।[১৮]

জীবনে তাঁর তখন একটা দোলা লেগেছে । মানুষ গরীব আর বড়লোকে ভাগ হচ্ছে । দেখতে পাচ্ছেন যেন বড়লোককে ফিলিস্টাইন বলে দয়া করলেই তাদের সম্বন্ধে সব কথা বলা হয় না । তাদেরও মনদণ্ড আছে । অর্থ একটা প্রচণ্ড শক্তি, কারণ সেটা মানুষের, বহু মানুষের শ্রম । জীবন কতো বড়, ফুলগুলো কি সুন্দর, আকাশ কত গভীর নীল । এইরকম অনুভবের মাঝে স্কুলের গণ্ডীটা অতিক্রম করে তিনি প্রবেশ করলেন কলেজ জীবনে । কোচবিহারের ভিক্টোরিয়া কলেজে আই.এ. পড়তে ভর্তি হলেন । কিন্তু ১৯৩৫ সাল তাঁর জীবনে প্রথম আর একটি নতুন মোড় বয়ে নিয়ে এলো । কারণ এ বছর বছরই টাইফয়েডের কবলে পড়ে আই.এ. পরীক্ষা দেওয়া হলো না । স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিলো, স্বাস্থ্য ফেরাতে গেলেন তিস্তা নদীর ধারে কুড়িগ্রামে দিদির বাড়ীতে । তিস্তা নদীর জলের উপরে বাতাসের গরম একরাশ সতেজতা ছড়িয়ে দিলো তাঁর চেহারায় । সেখানেই এক ভদ্র ভদ্রমহিলার সাথে আলাপ হয়ে গেলো । ভদ্রমহিলা এবং তাঁর স্বামী দুজনেই বেহালা বাজাতেন, চেহারা দুজনেরই রোগা রোগা হলুদ হলুদ, ইংরেজি গান জানতেন এবং বাঙালি । ভদ্রমহিলা তাঁকে দুটি বই পড়তে দিলেন - ক্যাবিট ও বাভেনব্রুক্স । বইদুটোর নাম উল্লেখযোগ্য কারণ তাঁর জীবনে এ দুটো প্রথম উপন্যাস হয়ে এসেছিলো । এক নতুন উপলব্ধির স্বাদ মনে বয়ে নিয়ে তিনি ফিরে এলেন কোচবিহারে । আই.এ বছরটি তাঁর কাছে মূল্যবান । দিদির বাড়ী থেকে ফিরে এসে কলেজে যেতে শুরু করলেন । গোঁগাভা, চেখভের ইংরেজী অনুবাদ পড়ে সময় কাটতে লাগলো । শরৎচন্দ্রের সাথে পরিচয় হয়ে গেলো বড়ুয়ার 'দেবদাস' ছবি থেকে । হাতে লেখা পত্রিকা, কলেজ ম্যাগাজিনে গল্প এমন সব সময় কাটানোর হবিতে মাঝে মাঝে যোগ দিতেন । যথাসময়ে আই.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন তিনি । তারপর শুরু হলো অন্য ভাবনা ''কোচবিহার

ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে আই.এ. পাশ করার পর ভাবনার বিষয় দেখা দিলো। বাবা লেখাপড়ার ব্যাপারে important ইত্যাদি ভাবতে আরম্ভ করলেন। কোচবিহার ভিক্টোরিয়া কলেজ তখন নিচের দিকে নামছে। ১৯৩৮-৩৯ এর সেই সর্বব্যাপী রিসেসন। খরচ কমাতে B.Sc. উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সংস্কৃতের অধ্যাপককে দিয়ে বাংলা পড়ানো হচ্ছে, সর্ব বিভাগে অধ্যাপকদের সংখ্যা কমছে। বাবার ইচ্ছা ছিলো ইংরেজী পড়ি এবং তখন তাঁর ইচ্ছা হয়েছিলো পরীক্ষায় বিশেষ ভালো করি, কারণ বিশেষ ভালো ফল না হলে বিশেষ ভালো চাকরী হয় না। তাছাড়া ততদিনে তিনি বোধহয় অনুভব করেছিলেন, তার সন্তানের প্রতিযোগিতার মাঠে দাঁড়ানোর বয়স হয়েছে। লেখাপড়ার ব্যাপারে এই important বেছে পড়ার চেষ্টায় আমি কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। কিন্তু ওটাকে ভাগ্য না বললে accumulation of accidents বলতে হয়, মাঝে মাঝে প্রচণ্ড আঘাত পাওয়া আমার বাঁচার ব্যাপারে ধরে নিতে হয়। যেমন অসুখগুলো। আমার স্বাস্থ্য খারাপ নয়, ওষুধপত্র ধরে বাঁচি, কিন্তু যেমন সেই শৈশবের ট্রপিক্যাল স্কুলে যাওয়া, তেমন ক্লাশ এইটের থেকে আই.এ. পর্যন্ত প্রতি বছরে অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ম্যালেরিয়ায় ভোগা - আর ওই সময়েই সে পরীক্ষাগুলো, তাই নয়? কলকাতায় মাস তিন চার পড়ার পর কি হলো - সানস্ট্রোক হতে পারে, মেনিন-জাইটিস হতে পারে, মাথার কণ্টসমেত ইনজ্যুরী হলেই বা কি দোষ, back to pavilion ?!! ১৯ কলকাতায় যেকদিন ছিলেন থাকতেন ১১এ? হ্যারিসন রোডের মেসে। হেঁটে যেতেন স্কটিশে। কলকাতা থেকে ফিরে আসার ব্যথা বড্ড বেশী রকম মনে হয়েছিল তাঁর। একেই তিনি পরবর্তী সময়ে বলেছেন "সেই রাজনর্তকী দ্বারা পদাঘাত হলেম।" ১৯৩৭ এর কলকাতা রূপের [illegible] উঠিয়ে নর্তকীর

মতোই প্রতিভাত হয়েছিল তাঁর কাছে। অগত্যা কোচবিহারে ফিরতে হলো। ভিক্টোরিয়া কলেজে আবার ভর্তি হলেন। ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে। কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ও ইংরেজী বিভাগের প্রধান শরৎচন্দ্র গুপ্ত এমন একটি কাজ করলেন যা তাঁকে এক নতুন পৃথিবীর সন্ধান দিলো। তিনি লাইব্রেরীর লাগোয়া একটা ছোট্ট ঘরে একটা আলমারি বসিয়ে তাতে বই ভর্তি করে তার চাবিটা অমিয়ভূষণের হাতে তুলে দিলেন। মাস দুয়েকের মধ্যেই নেশা পেয়ে বসলো। সকাল দশটা থেকে পাঁচটা নন কলেজিয়েট হবার ঝুঁকি নিয়ে এই আলমারির নেশা প্রায় দুবছর তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো। এ সময়েই তিনি পড়লেন হার্ডি'র জুড দি অবস্কিয়োর, হাক্সলি'র ভেজনি ওয়ার্ল্ড। লরেন্সের সন এন্ড লাভারস, স্তাঁদাল, দস্তয়েভস্কি, টলস্টয়ের ছোটগল্প, হেনরিক সিংকের লেখা, সালমা লাগেরলাফের লেখা ইত্যাদি।[৩৩] এর ফলে যা হবার তা হলো। অনার্স পেলেন কিন্তু পরীক্ষার খাতায় ফল খুব একটা ভালো হলো না। এদিকে তখন জীবনে এসেছে রিসেশান আর ডিপ্রেশানের ধাক্কা। বাবা অনন্তভূষণের কোচবিহারে থাকা বেশ কষ্টকর ছিলো। তিনি বরং পাবনায় জমিজিরাত নিয়ে ফিউডাল ধাঁচের জীবনে স্বচ্ছন্দ্য ছিলেন। কোচবিহারে যে ব্যাঙ্কে তিনি কাজ করতেন সেই ব্যাংক শুধু তাকে অর্ধেক বেতনে রেখে ব্যাংকটাকেই গুটিয়ে [illegible] ফেলার আয়োজন করলো। এদিকে তখনও অমিয়ভূষণের ছোট ভাইদের কলেজে পড়া বাকি। তাই কলেজের পরীক্ষার ফল বেরোনোর এক মাসের মধ্যে চাকরি। ডাকঘরে কেরানী। প্রথম পোস্টিং হলো রাজশাহী জেলার মহাদেবপুরে। এখানে যাবার প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, "এই চাকরীর ব্যাপারে একটা কথা বলা দরকার। খুব সামান্য চাকরি, পোস্ট অফিসে কেরানীর, কিন্তু চাকরিতে পৌঁছে দিতে রাজশাহী জেলার সেই গ্রামে আমার সঙ্গে আমার মামা গিয়েছিলেন। এটা বলা দরকার অ্যাডভোকেট হিসাবে তখন তাঁর আয় আমার বেতনের চল্লিশগুণ হবেই। এটা একটা প্রমাণ আমার মামার ভালোবাসার ও তৎকালীন আমাদের পারিবারিক আদর্শের। মামা যেন এই ঘোষণা করেছিলেন আর্থিক সঙ্গতি দিয়ে মানুষের বিচার হয় না, চাকরিটা করবে [illegible]

বটে কিন্তু মানুষ হিসাবে তোমার দাম কমছে না । তো, মামা সেই গ্রামের রাজামশাইকে ডাকাডাকি করে প্রাসাদের বাইরে এনে নিজের পরিচয় দিতেই আমরা সেই মার্বেলমেঝের রাজপ্রাসাদে অতিথি হলাম, রাজার কাছারিতে বসানো ডাকঘরে কাজ করতে শুরু করলাম । কিন্তু মামা ফিরে যেতেই আমিতো রাজ অতিথি থাকতে পারি না, তবে রাজার আদেশে তার এক কর্মচারীর অতিথি হলাম । আর তখনই প্রথম সূত্রপাত সেই অন্ধকার আর নিঃসঙ্গতার, যা আমাকে অনেকদিন ঘিরে ছিলো । আকাশের পাখি ঘেরাটোপের খাঁচায় ।...[৩১] চাকরি পাবার কিছুদিনের মধ্যেই বিয়ে । অমিয়ভূষণ তখন বাইশ আর স্ত্রী গৌরী দেবী ষোড়শী । পুরো নাম গৌরী চক্রবর্তী । পিতা রাধিকা-রঞ্জন চক্রবর্তী । রাধিকারঞ্জন খুব একটা বড় চাকরি না করলেও মানুষ হিসেবে অত্যন্ত সজ্জন ছিলেন । সমস্ত জীবন ধরে তিনি নিজে বাড়ীতে চরকায় সুতো কাটতেন । আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য মেয়ে জামাইকে সেরকম কিছু উপহার দিতে পারেন নি । তবে একবার নিজের কাটা সুতো থেকে তৈরী একটি খদ্দরের ধুতি জামাইকে উপহার দিয়েছিলেন । গৌরী দেবীর বাড়ি ছিল কলকাতার ঢাকুরিয়ায় । অবশ্য বিয়েটা ঢাকুরিয়ায় হয়নি । লেখকের বাড়ীর বয়োজ্যেষ্ঠরা অতদূরে বিয়ে উপলক্ষ্যে যেতে প্রস্তুত ছিলেন না ; তাই বিয়ে হয়েছিলো কোচবিহার শহরেই নিউটাউনের কাছে(কাচুয়া সাহেবের বাড়ীর উল্টোদিকে) একটি বাড়ী ভাড়া নিয়ে । সময়টা ছিলো শীতকাল । কলকাতা থেকে যাঁরা বিয়ে উপলক্ষে কোচবিহারে এসেছিলেন এখানকার প্রকাণ্ড আকারের কমলালেবু(পাশের ভুটান রাজ্য থেকে আসা) এবং কোচবিহার প্রসিদ্ধ অমৃতলাল দাসের 'অবাক' নামে সোপ কেকের মত গড়নের সন্দেশ খেয়ে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন । গৌরী দেবী তখন মাত্র ম্যাট্রিকুলেশনের টেস্ট পরীক্ষা দিয়েছেন । বাসরঘরে গৌরবর্ণ অপরূপ পুরুষটির দিকে

আড়চোখে মুগ্ধতার রেশে ডুবে ছিলেন ষোড়শী গৌরী । জীবন-সঙ্গিনীর প্রতি অমিয়ভূষণের প্রথম প্রশ্ন ছিলো ''তুমি কি পড়বে ?'' উত্তর হয়েছিলো, ''আপনি যদি অনুমতি দেন তবেই ।''[৩২] অনুমতি অবশ্যই দিয়েছিলেন তিনি । পরবর্তী জীবনে ম্যাট্রিকুলেশান পরীক্ষায় পাশ করার পর তিনি আই.এ. পরীক্ষা দিয়েছিলেন ও সসম্মানে উত্তীর্ণা হয়েছিলেন । সন্তানের জন্মের পর অবশ্য আর বেশীদূর লেখাপড়া করা হয়ে ওঠে নি । তিনি ছিলেন অমিয়ভূষণের লেখার একনিষ্ঠ পাঠিকা । প্রতিটি অনুচ্ছেদ লেখার সাথে সাথেই তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তা পড়তেন এবং উৎসাহ দিতেন । ১৯৮৪ সালে গৌরীদেবীর মৃত্যু হয় ।

১৯৪৩-৪৪ সালে বাবা অনন্তভূষণ আবার সেই পাবনার নীলকুঠিতে ফিরে গিয়েছিলেন । কিন্তু সেই নীলকুঠিতে আর কালের ছোঁয়া বাঁচিয়ে অবিকৃত থাকতে পারে না ? বাস্তবের তাপ লেগে তখন তা একটা ধ্বংস স্তূপ । তখনতো তা মনের মধ্যে এক মিশিয়া রঙে আঁকা দুর্গ নয়, বরং অনেক শরিকের দাবিতে জরাজীর্ণ মুল্পবিত্ত গেঁয়ো জোতদার গোষ্ঠীর আশ্রয়স্থল । রাজা রাজবল্লভের মতো অথবা রাজা রামমোহনের মতো শৈশবস্মৃতিমাখা এই বাড়ি তাঁকে মাঝে মাঝে প্রভাবিত করে । বাড়ির সেই লোহার দরজাগুলো এখনও মাঝে মাঝে মনের মধ্যে বন্ধ হয়ে যায় সমাজের তৈরী অভাববোধের, ব্যবসায়ীদের বিজ্ঞাপনে তৈরী অভাববোধের এবং যাবতীয় র‍্যাটরেসের মুখের উপরে ।

অমিয়ভূষণ চাকরি গ্রহণ করেছিলেন জীবনযুদ্ধে টিকে থাকার জন্যে । বাবা অনন্তভূষণ ও দুর্গাকার সেই নীলকুঠির কাছাকাছি থাকার জন্যে তিনি পাকপি পোস্ট অফিসে বদলি নিলেন ''বাবার কাছাকাছি থাকার জন্য এই সময়ে আমি পাকপি রেল কলোনীর

পোস্টাপিসে বদলী হয়ে যাই। ডাকঘরে চাকরি করি, রেলবাবুদের সঙ্গে ওঠাবসা গালগল্প। ওদিকে আমার একটা বাসা আছে যার ভাড়া মাসে চার আনা। সেই সুন্দর সিমেন্ট বাঁধানো মেঝে, খড়ের পুরো ছাদ, বাঁশের বাতার দেয়াল, অফুরন্ত কলের জল - আর বিশ টাকায় ঘি, দুধ, মাছে বাঙালীর স্বর্গ। বাবা পাল্কি পাঠিয়ে মাঝে মাঝেই বেটা - বউকে নিয়ে যান। আমি দু চারদিন একা একা থেকে এক বিকেলে অফিস শেষ করে বাড়ির উদ্দেশ্যে হাঁটতে থাকি। আমার পাকসির বাসা থেকে পাকুড়িয়া গ্রামের বাড়ি তিন মাইলের কম। কোন কোন সময় বিকেলে ঝড়বৃষ্টি উপেক্ষা করে সেই অভিসার। কোন কোন সময় মা বউ বেটাকে পাঠিয়ে দেন পাকসির বাসায়। তখনও কুড়িতে না পৌঁছানো সেই স্ত্রী।''৩৩ কিন্তু সবকিছুর মধ্যে থেকেও এক তীব্র হতাশায় তিনি ভুগতে থাকলেন। যৌবনের সেই অপরিশুদ্ধ নোংরা কলংকিত পরিবেশে চাকরী করার হতাশা। লিখতে শুরু করে তিনি সেই হতাশা থেকে মুক্তি পেতে চাইলেন। এ সম্বন্ধে তাঁর নিজের কথায় বলা যায় ''এসব সত্ত্বেও আমি সুখী হতে পারছিলাম না। কোচবিহারের কম্পিটিশানহীন লেখাপড়ার পৃথিবীর বাইরে একাতো ছিলামই, ঈশ্বর উপরন্তু আলোর বদলে, নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার বদলে, এ কি কালো আর নিদাঘ কঠোরতা। এখানে কম্পিটিশানই সার কথা, এখানে টাকা দিয়ে মানুষ মাপা হয়, চাকরি চাকরি বড় হলে টাকা বেশি, সুতরাং সে বড় এবং বেশি মানুষ। ফলে তখনকার মনের সেই নিঃসঙ্গতার পাশে পাশে একটা দারুণ চাপ পড়ছিলো, তাকে একরকমের inferiority কমপ্লেক্স বলে বোধহয়। নিজের অভাববোধ নেই, চারিদিকের অভাববোধ উত্তাল ঢেউ হয়ে গ্রাস করতে চায়। এইরকম অবস্থায় ইতিপূর্বেই কাগজকলম নিয়ে সন্ধ্যার সময় বসা অভ্যাস হচ্ছিলো। লেখা আত্মস্থ হওয়ার

স্বাদ দেয়, একটা জরগ্রস্ত অবস্থায় অন্য রকমের আলোয় চোখ মেলা যায়, আমার সেই কোচবিহারের আমিত্বে থাকা যায়। এইভাবে টাকার অংক দিয়ে মানুষকে মাপার পৃথিবীকে অস্বীকার করতে আমার সেই অভাববোধহীন আমি দুটো কাজ করে বসেছিলো। কাগজ কলম নিয়ে বসা আর ট্রেড ইউনিয়ন করা। আমার চাকরি জীবনে ট্রেড ইউনিয়ন অনেকখানি জায়গা জুড়ে আছে। ... আমার ট্রেড ইউনিয়নে ভালোবাসা ছিলো, প্রতিবাদ ছিলো, তেজ ছিলো, ক্রোধ ও বিদ্বেষ ছিলো না।''[৩৪] এ প্রসঙ্গেই তিনি স্মৃতিচারণায় আর এক জায়গায় স্পষ্ট বলেছেন ''আসলে লিখতে আরম্ভ করার ইচ্ছা এসেছিলো নিজেকে বাঁচানোর তাগিদে। ম চাকরি করতে গিয়েও ভুলতে পারলাম না কলেজের সেই আলমারিওয়ালা অ্যালকোভকে। আর চাকরির জায়গাতো আমাদের সেই শহরও নয়। শান্তিনিকেতন একটা আশ্রম, একটা শহরের তুলনা হয় না। কিন্তু শান্তিনিকেতনের আবহাওয়া যেমন অন্য জায়গা থেকে পৃথক, তেমন পৃথক ছিলো এই শহরের আবহাওয়া, খারাপ কিছু অবশ্যই ছিলো। যে কোন জলাশয়ের তলায় পাঁক এবং উপরে শ্যাওলা থাকে, কিন্তু নিজের নিজের রুচি অনুসারে মাছেরা জানে জলের কোন স্তরে তাদের সুখাবস্থান। লাইব্রেরী আর শহরের অভাব কিছুটা ভুলিয়ে দিতে পারতো টাকা এবং চাকরীর নেশা। নেশাটা কোনদিনই লাগলো না। এই শূন্যতাকে আরও পীড়িত করতো সেই রাজনর্তকীর প্রত্যাখান। পড়া আরও পড়া, সাদা কাগজ পেলে টুকিটাকি লিখে ভাষাকে দোমড়ানো মোচড়ানো, তা ইস্পাত না ঢালাই লোহা তা পরখ করা - এই সব দিয়ে সময় কাটাতে শুরু করেছিলাম। কবিতা লিখতাম না, চাকরি পাওয়ার কয়েক মাসের মধ্যে বিয়ে হয়ে গিয়েছে, কবিতা লেখার মতো মন হলেই সেই ভ্রমশিলাকে চিঠি লিখি।''[৩৫] অমিয়ভূষণের প্রথম প্রকাশিত লেখা একটি নাটক, নাম 'দি গড অন মাউন্ট সিনাই', প্রকাশিত হয়েছিলো 'মন্দিরা' পত্রিকায়, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ় সংখ্যা, ১৩৫১।

এরপর থেকে তিনি ছোট গল্প লিখতে থাকেন। নিজের লেখা গল্প প্রকাশের ইতিহাস তাঁর মুখ থেকেই আমরা সুন্দর করে জানতে পারি ''চল্লিশের দশকের গোড়া থেকে একাঙ্ক নাটক লিখতাম। ১৯৪০-৪৪ হবে, বছরটা ঠিক মনে পড়ে না, এই সব নাটকের একটা 'মন্দিরা' নামে কলকাতার এক কাগজে প্রকাশ পায়। আমার ভাই বোধহয় এটাকে মন্দিরার সম্পাদিকাকে দিয়ে থাকবে। এর কিছুদিন পরে, আমার সেই কুড়িতে না পৌঁছানো স্ত্রী দেখতেন সন্ধ্যার পর লণ্ঠনের আলোয় কাগজ কলম নিয়ে টেবিলে বসে থাকি। পরের দিন সকালে উনুন ধরানোর ছেঁড়া কাগজও পেতেন। হয়তো উনুনে গুঁজে দেয়ার আগে হাতের লেখাটা প্রিয় বলে উল্টেপাল্টে সে সব পড়তেন। একদিন সন্ধ্যায় বলে ফেললেন, 'লেখো তো বটে, ছাপে না তো কেউ'। যোগাযোগের ফলে টেবিলের উপরে একটা পত্রিকা ছিলো। আমার ছোট ভাই ট্রেনে পড়ার জন্য কলকাতায় কিনেছিলেন। পত্রিকাটি তখনকার দিনের প্রবাসী ভারতবর্ষ ইত্যাদি নয়, শনিবারের চিঠি বা দেশ পত্রিকাও নয়। পূর্বাশা নামক সেই পত্রিকা সেই প্রথম দেখলাম। কয়েকটা লেখায় নতুন ধরন ছিলো। সেদিন যেটা লিখেছিলাম পরের দিন সেটাকে শেষ করে তার পরের দিন সেটাকে সম্পাদক, পূর্বাশার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম। পনেরো দিন পরেই হবে, কার্তিক মাস পড়তে না পড়তে একদিন আমার ঠিকানায় মনিঅর্ডার যোগে পনেরো টাকা দার এককপি পূর্বাশা এসে উপস্থিত। অবাক কাণ্ড। শুধু ছাপায় নি গল্পটা, এত তাড়াতাড়ি, আবার তার জন্য টাকাও। এই 'প্রমীলার বিয়ে' প্রকাশ হওয়ার পরে আর ফিরতে হয় নি। পূর্বাশা, আর তার পরে আনোয়ারের চাহিদায় চতুরঙ্গে লেখা শুরু হয়ে গেলো। পূর্বাশার অফিসেই বীরেনের(কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়) সঙ্গে আলাপ। আমার লেখা বেশী হতে থাকলে নীহাররঞ্জন রায়ের [illegible]

আর.এস.পি.-র কাগজ গণবার্তায় নিয়ে যান। চঞ্চল চট্টোপাধ্যায়-এর কাগজেও ওই একই ব্যাপার। ১৩৫৫-৫৬ হবে, পূর্বাশা পত্রিকার অজিতা চক্রবর্তী, আবু সৈয়দ আইয়ুবের অনুরোধে আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে যান। আইয়ুব সাহেব তখন বেশ অসুস্থ কিন্তু লেখককে দেখার ইচ্ছা হয়েছিলো।...[৩৬] সেই থেকে লেখার নেশায় মগ্ন অমিয়ভূষণ। লেখেন নিজের সুখের তাগিদে। লেখার পেছনে তাই থাকে intensive delight. অথচ তিনি যে উপন্যাস লিখতে চান তা আজও লেখা হয়নি। তিনি বলেন যে হয়তো তা কোনদিন ই লেখা হবে না, লেখা হলেও ছাপা হবে না, কিন্তু সেগুলোই তাঁর জাগ্রত ও নিদ্রার আনন্দ। এই আনন্দ ছাড়া জীবন অর্থহীন। সাহিত্যিকের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর বোধ অত্যন্ত পরিষ্কার। সাহিত্যিক সমাজ সম্বন্ধে ভালোমন্দ নিশ্চই ভাবেন, অন্যের চাইতে মানুষকে বেশী ভালোবাসেন বলে মানুষ তার অনুভূতিতে প্রোথিত। তাই তার বলাটা অন্য অনেকে যা বলেছে তার তার পুনর্বিন্যাস হবে না। তাকে সমাজের চাইতে আগে আগে চলতে হয়। সাহিত্যিক এইটা মাত্র ঘোষণা করতে পারে, সে জীবনের পক্ষে, যা কিছু জীবনকে খর্ব করে, ক্ষুন্ন করে, শোষণ করে, বন্দী করে, পদানত রাখতে চায় তার সঙ্গে সাহিত্যিকের সদ্ভাব হতে পারে না। সে জন্যে সাহিত্যিক রাজনীতিক হয় না, ধার্মিকও হয় না।

১৯৪৬ সালে কলকাতার নরমেধ যজ্ঞ এসে আছড়ে পড়লো [illegible] পাবনার গ্রামে। এতকালের নিশ্চিন্ত বসতবাটি ছেড়ে এবারে অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে পাড়ি দেওয়া। কি করে এতকালের চেনা গাছপালা নদী ঢেউ সমস্ত অচেনা হয়ে গেলো নীরব অসহায় চোখে সেই আর্তি ? ৪৬ সালের শেষদিকে মা এবং পরিবারের স্ত্রী ও শিশুদের কোচবিহারে পাঠিয়ে দেওয়া হলো। ১৯৪৭ এর মাঝামাঝি সময়ে সেই দুর্গাকার বাড়ির থেকে মিথ্যা টেলিগ্রাম করে বাবাকেও পাঠানো হলো কোচবিহারে। এই

বছরেই ২রা অথবা ৩রা আগষ্ট তিনিও কোচবিহারে বদলি হয়ে চলে এলেন। আবার যেন ঝড়ের পদ্মায় একটুকরো আশ্রয় অবলম্বন করে সাঁতার কাটা। তখন বাবার বয়স প্রায় ষাট। এবারে বাধ্য হয়ে মাথাস নীচু করে নতুন করে এক ব্যাংকে চাকরি নিলেন। দেশভাগের যন্ত্রণার এক নীরব সাক্ষী হয়ে নিদারুণ কষ্ট পেয়ে এই নির্বাসিত মানুষটি তার বাদবাকী দিনগুলো অমিয়ভূষণের সামনেই কাটিয়ে গেছেন। ডাকঘরে কেরানী হিসেবে চাকরী জীবন শুরু করেছিলেন আবার এই ডাকঘর থেকেই ১৯৭৬ সালে ডেপুটি পোষ্ট মাষ্টার হিসেবে রিটায়ার করেছেন। বর্তমানে কোচবিহার রাজবাড়ির কাছে মিউনিসিপাল মার্কেট রোডে এই সাহিত্যসাধক তাঁর শিল্পকর্মের সাধনায় নিমগ্ন আছেন।

অমিয়ভূষণ মজুমদারের জীবনের যে সব দিকগুলো এখানে আলোচনা করা হলো তা থেকে এবং এ ছাড়া অতিরিক্ত আরো কয়েকটি সূত্র থেকে আমরা কতগুলো বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি -

পাবনার দুর্গের মত বাড়ী এবং পদ্মা নদী বারবারই তাঁর লেখায় ঘুরেফিরে এসেছে। জীবনে যাকে দুচোখ মেলে দেখেছেন লেখায় যেন বারেবারে তাকেই স্বীকার করেছেন। জন্মস্থান কোচবিহার এবং তার শান্তিনিকেতনের চাইতে দশগুণ বিশাল পরিবেশের বিস্তৃতি জীবনের মতো লেখাকেও আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ফিউডাল জীবনের মহিমা ও সৌন্দর্যের আকর্ষণ বিষয়ে একটা মুগ্ধতা ও থেকে গেলে।

পরিবারে তিনিই একমাত্র সাহিত্যকর্মে নিযুক্ত নন। বলা যেতে পারে এই লেখার বীজ বুনে দিয়েছিলেন দিদিমা কুমুদেন্দু দেবী। তিনি 'নলিনী' নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। সে আমলের কোন একটি পত্রিকায়(অবলাবান্ধব বা ওই জাতীয় কোন পত্রিকায়) তা কিছুটা প্রকাশিতও হয়েছিল। এছাড়া দিদিমার লেখা কিছু কবিতাও অমিয়ভূষণের সংগ্রহে আছে। কেশব সেনের

মেয়ে মহারানী সুনীতির লেখা কবিতা গ্রন্থে দিদিমার Collaboration ছিল বলে অনুমান করা হয়। কুমুদেন্দু দেবী মার্জিত রুচি ও উদার মনের প্রভাব ফেলেছেন। অমিয়ভূষণের উপরে উত্তরাধিকারের মতো। অমিয়ভূষণ তাঁর 'নীলভূঁইয়া' উপন্যাসটি উৎসর্গ করেছেন সমস্ত গল্পের উৎস দিদিমাকে যাকে তিনি ডাকতেন 'কালোদি' বলে।

অমিয়ভূষণের সম্পর্কে মামাতো ভাই প্রবীর গোস্বামী 'পারাবত' এই ছদ্মনামে 'এম.এল.পম্পা' ও 'আমি সিরাজের বেগম' নামে দুটি উপন্যাস লিখেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি কলকাতা পুলিশের সার্জেন্ট ছিলেন। পেশার চাপে পড়ে শেষ পর্যন্ত অবশ্য বেশী লেখা হয়ে ওঠে নি। অমিয়ভূষণের একভাই অপনিভূষণ মজুমদার 'বনফুল' নামে একটি গল্প সংকলন লিখেছিলেন। সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো তাঁদের পরিবারে এমন কেউ কেউ আছেন যারা বিশ্বাস করেন যে সতীনাথ ভাদুড়ী তাদের আত্মীয় নন। এ সূত্রে একটি গল্প আছে।[৩৭] অমিয়ভূষণের মা'র বড় মামার নাম ইন্দুভূষণ ভাদুড়ী। ইনি কৃষ্ণনগরের এ্যাডভোকেট ছিলেন। তাঁর দুই ছেলের মধ্যে একজনের নাম ছিল মন্টু। এর সাথে লেখকের একবার ছেলেবেলায় দেখাও হয়েছিল। বয়সে তিনি লেখকের চাইতে বছর দশ।এগারোর বড় ছিলেন। এই মন্টু পরে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন। তার ভালো নাম আজ আর কেউ মনে করতে পারেন না। লেখকের পরিবারে বয়স্কদের মধ্যে এমন একটি ধারণা প্রচলিত আছে যে এই মন্টুই পরবর্তী জীবনে সতীনাথ। এই বিশ্বাসটিকে সত্য বলে ধরে নিলে মেনে নিতে হয় যে সতীনাথ ভাদুড়ী সম্পর্কে তাঁর মামাতো ভাই।[৩৮] তাহলে দেখা গেলো যে সাহিত্য-রচনার একটা পূর্বসূত্র থেকেই গেছে। পরিবারে যে সাহিত্যভাবনাটি প্রোথিত ছিল তাকেই অন্যদের সাথে লালন পালন করে নিজস্ব মৌলিকতায় প্রোজ্জ্বল করে তুলেছেন তিনি।

মামা বাড়ির ব্রাহ্ম আবহাওয়া তাঁর মনের গড়নটাকে একটা আলাদা আদল দান করেছিল । এর প্রভাব ও ছোঁয়া তাঁর লেখাকে ঘিরে আছে । মামাবাড়িতে ব্রাহ্মসমাজের লোকজনের যাতায়াত ছিল ফলতঃ হিন্দুয়ানার - গোঁড়ামিমুক্ত এক অনাবিল মুক্ত পরিবেশ সেখানে বর্তমান ছিল । তাইতো সরস্বতী পুজো হলেও কোন প্রতিমা থাকতো না । একটা কাঠের বাক্সে দলিল দস্তাবেজ ভরে তার সামনে বই রেখে পুজো করা হতো । লক্ষ্মীপুজোর সময় একটা ঝাঁপির মধ্যে ধান ভরে লাল শাড়ী দিয়ে ঢেকে পুজো করা হতো । এ সমস্তটাই হয়ত বা কেশব সেনের প্রভাব বলা যেতে পারে । মাতুলালয়ের এই অভাববোধহীন মার্জিত রুচির ছোঁয়া লেখক যেন উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জন করেছেন । এই উত্তরাধিকার আকাশের মতো তাঁকে গ্রাস করে রেখেছে ।

তাঁর লেখায় সবচেয়ে বেশী করে এসেছে তাঁদের পরিবারের উদ্বাস্তু হবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা । ছিন্নমূল মানুষের এই যন্ত্রণার ছাপ গোটা পরিবারের মধ্যে বিশেষ করে তাঁর বাবার ভেতরে সারা-জীবন ধরে দেখেছেন তিনি । দেশভাগ রাজনীতির মানুষদের অপকর্মের ফল, এই মর্মন্তুদ ব্যাপার কালের প্রবাহকে বদলে দিচ্ছে । হোসেন শাহের আমল থেকে হিন্দু মুসলমানের যে মিলনের ধারাটি চলে [illegible] আসছিলো তাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে এই ভিক্ষা । কলকাতার রাস্তায় যেমন এর পরিণাম দেখা গেছে ঠিক তেমনি গ্রামেও একই ভাবে দেখেছেন তিনি । গ্রামের নিশ্চিন্ততার আশ্রয় ছেড়ে বারবার তাঁদের পরিবারের লোকজনদের আশ্রয় নিতে হয়েছে কোচবিহারে । ১৯২৯ সালে প্রথমবার যখন চল্লিশ বছর পার করে দিয়ে স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়ে সামান্য একটা চাকরি নিয়ে তাঁর বাবা কোচবিহারে এসেছিলেন তখন তার নাম আমরা কি দিতে পারি ? উদ্বাস্তু হওয়া ? 'একমোডাম '? অনেকটাই সে রকম । সন্তানদের শিক্ষা সংস্কৃতির জন্য এই বহির্গমন । [illegible]

তাই কোচবিহারে অনন্তভূষণ কখনো সুখী ছিলেন না। ১৯৪৩ এ অমিয়ভূষণের ছোটভাই-এর কলেজের পড়া শেষ হতেই অনন্তভূষণ ফিরে গিয়েছিলেন নিজের গ্রামে নির্বাসিত ষোলো বছরের ক্লান্তি মুছে ফেলার জন্য। কিন্তু ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসে, মাত্র চার বছরের মধ্যেই রাজনীতির লোভ লালসায় এই উপমহাদেশে যে ধ্বংসের সর্বনাশা বীজ ফুলে উঠেছিল তার বলি হতে হলো তাকে। ১৯৪৭এ বাধ্য হয়ে আবার কোচবিহার যাত্রা। এবার আর স্ব-ইচ্ছায় নয়, বাধ্য হয়ে। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' তখন শেকড় উৎপাটিত করে কত মানুষকে যে আশ্রয়হীন করে দিয়েছিল তার ইয়ত্তা নেই। ঝড়ের পদ্মায় সাঁতার কেটে অনন্তভূষণ তার বাকী জীবনটা কোচবিহারে সুতীব্র যন্ত্রণায় কাটিয়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। অমিয়ভূষণের চোখের সামনে এইসব ঘটনা ঘটেছে। তাই তিনি তাঁর প্রায় সমস্ত লেখাতেই মেলে ধরেছেন ঘরহারা মানুষের এই সুতীব্র যন্ত্রনার কথা, আকুল আর্তির কথা। মূলহীন মানুষের এই যন্ত্রণা, তাদের নতুন করে ঘরবাঁধার প্রয়াস কখনোবা সফলতা পেয়েছে আবার কখনো বা হারিয়ে গেছে রাজনীতির [illegible] পঙ্কিল ঘূর্ণাবর্তে।

পরিণতি এই সাহিত্য সাধকের বাস উত্তরবঙ্গে। এ এমন এক জায়গা যাকে স্বাধীনতার একত্রিশ বছরও যথেষ্ট পরিমাণে নোংরা আর বিক্রি করে ফেলতে পারে নি। যার কপালে কাঞ্চনজঙ্ঘার হীরার মুকুট। এখানকার কৃষি প্রধিক্যে ঔপনিবেশিক শহরের জন্য অন্ন যোগান দেয়। এই সেই পবিত্র ভূমি যেখানে প্রাচীন বাঙলার ঐতিহ্য, নীল বিদ্রোহ - সাঁওতাল বিদ্রোহ - সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মাটির সাথে মিশে আছে। অ্যাংলো স্যাক্সনি মুখোশ আঁটা

শহর জীবন থেকে বহু দূরে এই অরণ্যঘেঁষা জীবনে তিনি তাঁর লেখনী এখনও সচল রেখেছেন এটাই আমাদের বড় গর্বের বিষয়। কলকাতা কেন্দ্রিক ইংরেজী শিক্ষিত আধুনিকতাকে তিনি বেশী মূল্য দিতে রাজী নন, বরং আবহমান বাঙালির ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান তিনি।

তথ্যসূত্র

১. সঞ্জয় ভট্টাচার্য - পূর্বাশা পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা, ১৩৬০ ।

২. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় - বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, ৬ষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ সংস্করণ, পৃ.৭৫১ ।

৩. ডঃ সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় - বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, ১৯৭৫, পৃ.৩১৭ ।

৪. ডঃ উজ্জ্বলকুমার মজুমদার - উপন্যাসে জীবন ও শিল্প, ১৩৮৪, 'উপন্যাসের ভিত্তি' অধ্যায়, পৃ.২৬ ।

৫. ডঃ কমলকুমার সান্যাল - উপন্যাস ও ম উপন্যাসিক, ১৯৮৪, পৃ.১৪৫, ১৪৬ ।

৬. ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় - কালের প্রতিমা, ১৯৭৪, পৃ.২৮০, ২৮১, ২৮২, ৩৪৭, ৩৪৮ ।

৭. বর্তমান নিবন্ধকারের সাথে শ্রীঅমিয়ভূষণের কোচবিহারের বাড়ীতে ১৮.৫.৮৮ তারিখের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রস্তুত ।

৮. অমিয়ভূষণ মজুমদার - আমার সম্বন্ধে, কৌরব, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯, পৃ.৬১ ।

৯. তদেব - পৃ.৭২ ।

১০. জীবনানন্দ দাশ - জীবনানন্দ দাশের কাব্যগ্রন্থ(প্রথম খণ্ড), আশ্বিন ১৩৮৪, পৃ. ২০৫ ।

১১. অমিয়ভূষণ মজুমদার - আমার সম্বন্ধে, কৌরব, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯, পৃ.৭২ ।

১২. অমিয়ভূষণ মজুমদার - নিজের কথা, লাল নক্ষত্র, আশ্বিন ১৩৯৩, পৃ.১৪৮, ১৪৫ ।

১৩. অমিয়ভূষণ মজুমদার - আমার মন্তব্যে, কৌরব, ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, পৃ.৭০ ।

১৪. নিবন্ধকারের সাথে শ্রীঅমিয়ভূষণের কোচবিহারের বাড়ীতে ২০.৫.৮৮ তারিখের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রস্তুত ।

১৫. অমিয়ভূষণ মজুমদার - নিজের কথা, লাল নক্স, আশ্বিন, ১৩১৩, পৃ.১৮৫ ।

১৬. নিবন্ধকারের সাথে শ্রীঅমিয়ভূষণের ১৮.৫.৮৮ তারিখের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রস্তুত ।

১৭. অমিয়ভূষণ মজুমদার - আমার মন্তব্যে, কৌরব, সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, পৃ.৭২, ৭৩ ।

১৮. অমিয়ভূষণ মজুমদার - নিজের কথা, লালনক্স, আশ্বিন ১৩১৩, পৃ.১৮৬ ।

১৯. মোস্তাফা কামাল - আজি হতে শতবর্ষ পরে, জেনকিন্স স্কুল শতবার্ষিকী স্মরণী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১, পৃ.৭৩, ৭৪ ।

২০. শ্রীঅম্বিকাচরণ রায় - ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষে কোচবিহার জেনকিন্স স্কুল শতবার্ষিকী স্মরণী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১, পৃ. ১, ২ ।

২১. অমিয়ভূষণ মজুমদার - নিজের কথা, লালনক্স, আশ্বিন ১৩১৩, পৃ.১৮৬, ১৮৭ ।

২২. অমিয়ভূষণ মজুমদার - প্রথম পরিচ্ছেদ, জেনকিন্স স্কুল শতবার্ষিকী স্মরণী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১, পৃ.৩১ ।

২৩. তদেব, পৃ. ৪৪, ৪৫ ।

২৪. শ্রীমবোধকুমার চক্রবর্তী - এই আমাদের স্কুল, জেনকিন্স স্কুল শতবার্ষিকী স্মরণী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১, পৃ.৫৩, ৫৪ ।

২৫. অমিয়ভূষণ মজুমদার - প্রথম পরিচ্ছেদ, জেনকিন্স স্কুল শতবার্ষিকী স্মরণী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৬১, পৃ.৪১ ।

২৬. তদেব, পৃ. ৪০, ৪১ ।

২৭. তদেব, পৃ. ৪৭, ৪৮ ।

২৮. বর্তমান নিবন্ধকারের সাথে শ্রীবিভূতিভূষণ চক্রবর্তী মহাশয়ের কোচবিহার এন.এন.রোডে'র বাসভবনে ৩.১২.৮৮ তারিখের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রস্তুত । এই সাক্ষাৎকারটি নেওয়ার কয়েক মাস পরেই শ্রীচক্রবর্তীর মৃত্যু হয় ।

২৯. অমিয়ভূষণ মজুমদার - নিজের কথা, আশ্বিন ১৩৯৩, পৃ.১৮৭, ১৮৮ ।

৩০. শ্রীঅমিয়ভূষণ মজুমদারের সাথে ডঃ অরুণকুমার সিকদারের ২৮.৫.৮৭ তারিখের টেপবন্ধ সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রস্তুত ।

৩১. অমিয়ভূষণ মজুমদার - নিজের কথা, আশ্বিন ১৩৯৩, লালমাটি, পৃ.১৮৯ ।

৩২. বর্তমান নিবন্ধকারের সাথে শ্রীঅমিয়ভূষণ মজুমদারের ২৫.৫.৮৮ তারিখের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রস্তুত ।

৩৩. অমিয়ভূষণ মজুমদার - নিজের কথা, লাল মাটি, আশ্বিন ১৩৯৩, পৃ.১৮৯, ১৯০ ।

৩৪. তদেব, পৃ. ১৯০ ।

৩৫. অমিয়ভূষণ মজুমদার - আমার সম্বন্ধে, কৌরব, সেপ্টেম্বর, ১৯৭১, পৃ. ৭১ ।

৩৬. অমিয়ভূষণ মজুমদার - নিজের কথা, লাল মাটি, আশ্বিন ১৩৯৩, পৃ. ১৯১ ।

৩৭. বর্তমান নিবন্ধকারের সাথে শ্রীঅমিয়ভূষণের কোচবিহারের বাড়ীতে ২৫.৫.৮৮ তারিখের সাক্ষাৎকারের ভিত্তিতে প্রস্তুত।

৩৮. অমিয়ভূষণের পরিবারের দু একজন বয়স্কদের এই ধারণা থাকলেও অমিয়ভূষণ স্বয়ং এ মত পোষণ করেন না তাছাড়া সতীনাথ ভাদুড়ীর জীবনী মূলক আলোচনাতে এর সমর্থন পাওয়া যায় না।